সোভিয়েত
ইউনিয়নের
বৈমানিক-মহাকাশচর
আলেক্সেই লেওনভ

'অ্যাপলো'-'সয়ুজ'
মহাকাশ অভিযানের
কাহিনী

প্রগতি প্রকাশন

মহাকাশে মিলন

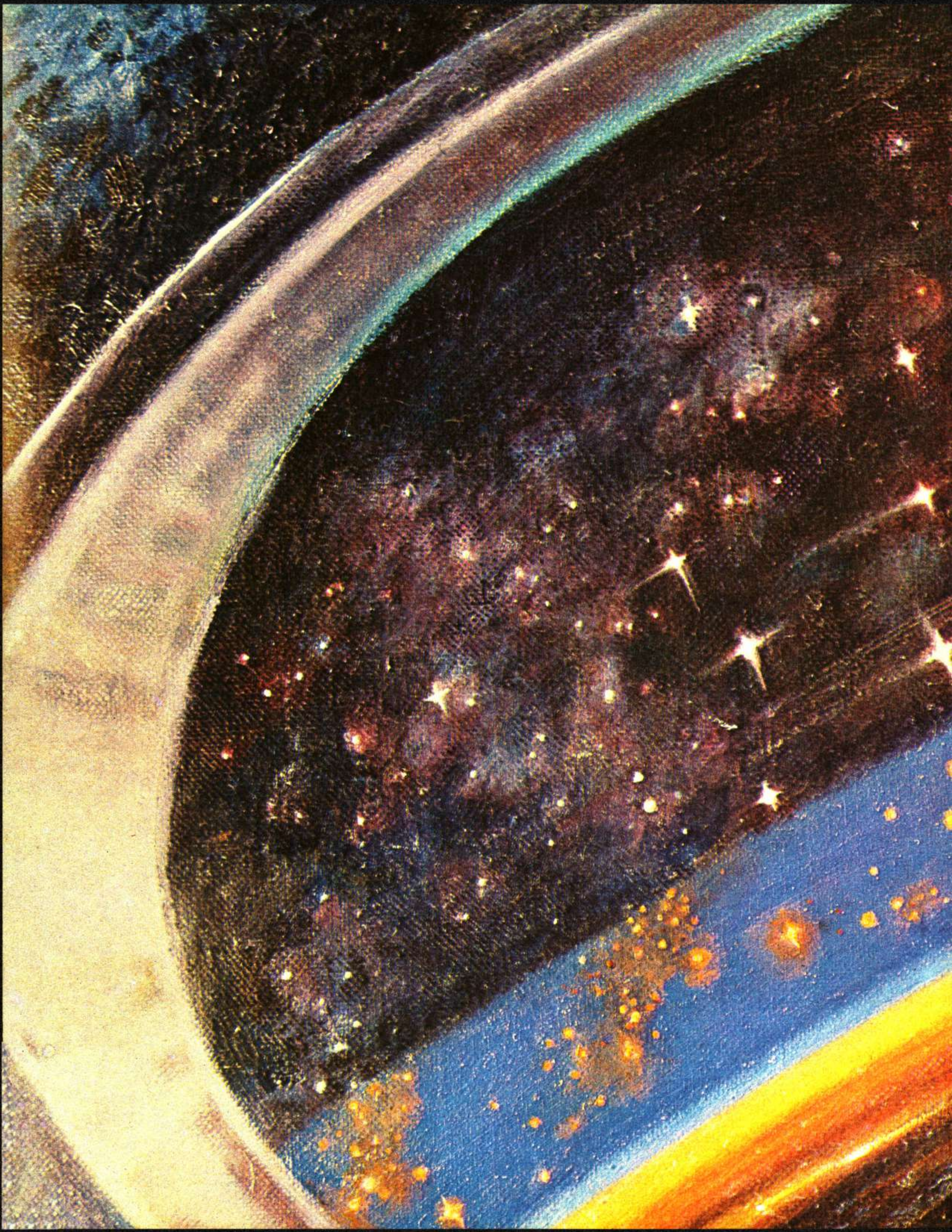

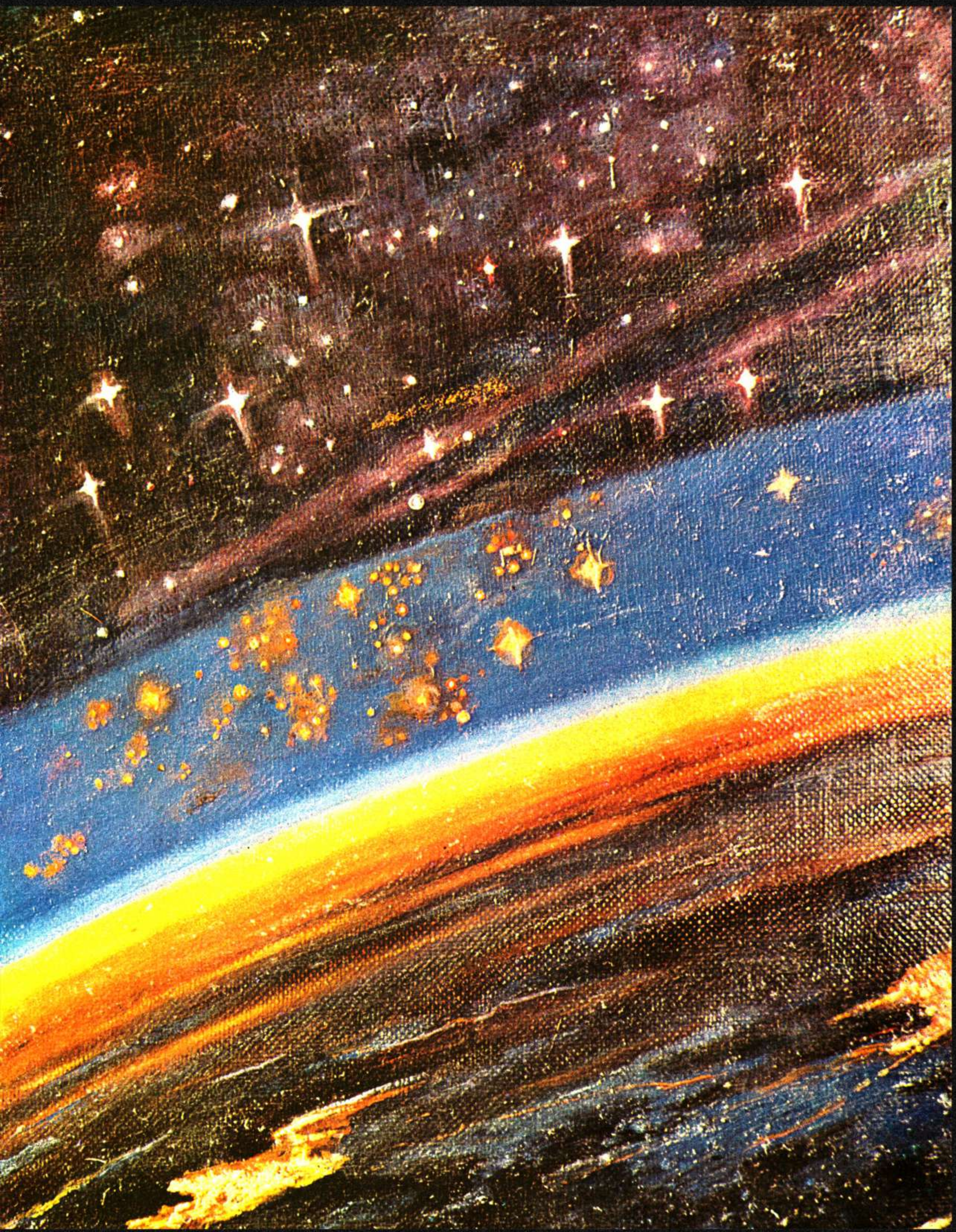

আলেক্সেই লেওনভ • মহাকাশে মহামিলন

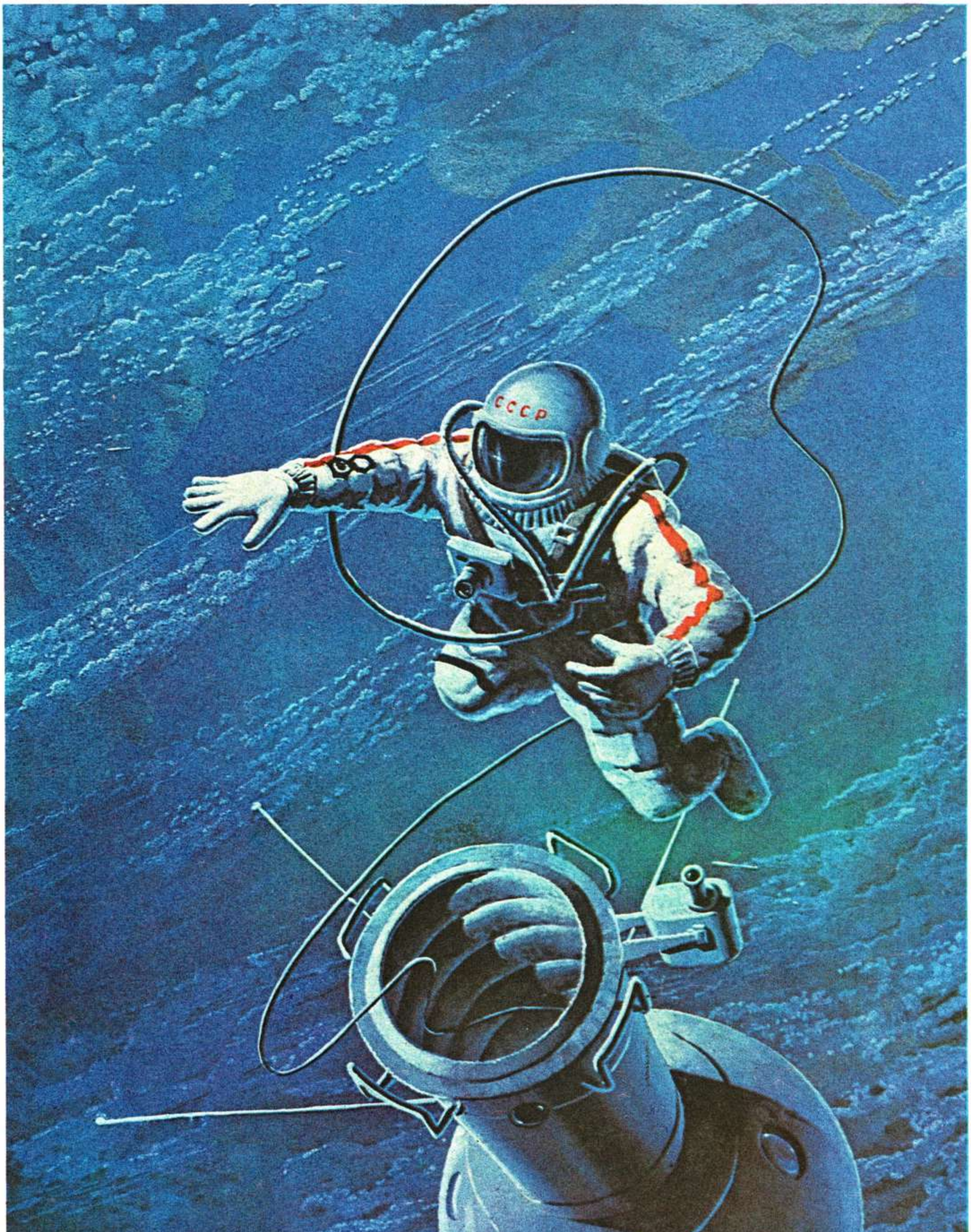
СССР

আলেক্সেই লেওনভ

মহাকাশে মহামিলন

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

ছবি এ'কেছেন আলেক্সেই লেওনভ

অনুবাদ: বিজয় পাল

А. ЛЕОНОВ

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР

На языке бенгали

© Издательство «Прогресс», 1978

© বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৮

Л $\frac{70802\text{-}866}{014(01)\text{-}78}$ 649-78

প্রিয় কিশোর বন্ধু!

তোমার হাতের এই বইখানি লেখা হয়েছে বিশেষ করে তোমারই জন্যে। তোমারই জন্যে আঁকা হয়েছে তার ছবিগুলো। জানি না, কী তোমার নাম, কত তোমার বয়স। তবে আমি জানি যে তুমি আমার বন্ধু। আর মানুষের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের চেয়ে মহৎ আর কী হতে পারে?

আমার বিশ্বাস, তোমার সম্বন্ধে অনেক ভাল কথাই আমি শুনতে পাব। তুমি যে আমাদের ভবিষ্যৎ, আর ভবিষ্যৎ সর্বদাই সুন্দর। তাই আজ তোমার কথা বেশি বেশি জানতে ইচ্ছে করছে আমার, এবং নিজের তরফ থেকে তোমাকেও বলতে চাই আমার বন্ধুদের কথা — সোভিয়েত আর মার্কিন মহাকাশচরদের কথা। তুমিও হয়তো মহাকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখছ? তাহলে 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলো' মহাকাশযান দু'টির যৌথ উড্ডয়ন-অভিযানের প্রস্তুতি কীভাবে হল ও অভিযানটি কেমন চলল সেকথা শুনতে তোমার ভাল লাগবে নিশ্চয়ই। তবে এসো, আগে আমাদের আলাপ হয়ে যাক। নাম আমার — আলেক্সেই লেওনভ্, আমি — সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈমানিক-মহাকাশচর। আর তোমার নাম কী? এই যে এখানেই তোমার নামটি লিখে ফেল।

বেশ, আলাপের পালা এবার শেষ। এখন তোমাকে বলতে পারি যে মহাকাশ থেকে তোমাকে আমি দেখেছি। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ভাবছ, আমি মজাক করছি? মোটেই নয়, আমরা মহাকাশচরেরা ওড়ার সময় মহাকাশ থেকে দেখতে পাই নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, দেশ-মহাদেশ। দেখতে পাই শস্যে ভরা মাঠ, সবুজ বন-জঙ্গল আর ধুধু করা মরুভূমি। এমনকি চিনতে পারি বড় বড় শহর। যেমন, আমাদের রাজধানী মস্কোর কথাই ধর না। রাত্তিরে সে কী সুন্দর! বিশেষ করে উঁচু থেকে দেখলে। নিচে শুধু আলো, আলো আর আলো, যেন আলোর সীমাহীন এক সমুদ্র। নিওনের বহুরঙা বিজ্ঞাপনের ঝকমকানি দেখে মনে হয় যেন ওখানে রয়েছে বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড, ধিকি ধিকি জ্বলছে তার লাল টকটকে কয়লা। এই সবকিছুই বড়ো জীবন্ত, বড়ো প্রাণপূর্ণ, তা আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে, হাসে ও পরে ডুবে যায় অনন্ত অন্ধকারে।

আমার বন্ধুদের যারাই মহাকাশে গেছে, সবাই তারা খুব মুগ্ধ হয়েছে এই সবকিছু দেখে:

— কী সুন্দর আমাদের ওই নীল পৃথিবীটা!

তুমি জান, কেন আমরা এ রকম বলি? কারণ এই পৃথিবীতেই তুমি মানুষ হচ্ছ। মহাকাশ থেকে আমরা তোমাকে দেখতে পাই, তোমার হাসি আমাদের সাহায্য করে সেই অতল গভীরে, যেখানে শুরু নেই, শেষ নেই, নেই ওপর, নেই তল। আমরা জানি, আমাদের প্রতিটি অভিযানের খবরাখবর তুমি রাখ। সময়-সময় আমাদের মনে হয়, মহাকাশযানে তুমিও রয়েছ আমাদের সঙ্গে, এবং সেই জন্যেই আমরা চেষ্টা করি, অভিযানগুলি যেন ভালভাবে চলে।

'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' অভিযান

'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' অভিযান কথাটি তুমি নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। তবে আসলে তা কী সে বিষয়ে তোমার হয়তো কোন স্পষ্ট ধারণা নেই।

বুঝিয়ে বলছি। অভিযানটির পুরো নাম — 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযান।

১৯৭৫ সালের ১৫ই জুলাই বিকাল ৩টা ২০ মিনিটে [মস্কো সময় অনুসারে] সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইকোনুর মহাকাশ ঘাঁটি থেকে যাত্রা শুরু করে 'সয়ুজ-১৯' মহাকাশযান। তাতে ছিলাম আমরা দু'জন — আমার বন্ধু ভালেরি কুবাসভ আর আমি। সাড়ে সাত ঘণ্টা পরে, রাত ১০টা ৫০ মিনিটের সময় — মস্কোয় তখন রাত, আর আমেরিকায় সবে বিকেল — কানাভেরাল অন্তরীপ থেকে যাত্রা শুরু করে মার্কিন মহাকাশযান 'অ্যাপলো'। এর ভেতরে ছিল আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা — টমাস স্ট্যাফোর্ড, ভ্যান্স ব্রান্ড ও ডনাল্ড স্লেইটন। ১৯৭৫ সালের ১৭ই জুলাই মার্কিন মহাকাশযানটি চলে আসে সোভিয়েত মহাকাশযানের কাছাকাছি, এবং সেদিনই সন্ধ্যা ৭টা ১২ মিনিটে (মস্কো সময় অনুসারে) 'অ্যাপলো' ও 'সয়ুজের' সংযোজন ঘটে। সংযোজনের পরে কী হল তা-ই আমি বলব, তবে তার আগে অন্য একটি কথা বলে নিই। কথাটি হল এই যে সংযোজনের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমারই সমবয়সী এক ছেলে — নাম তার পিওতর গ্রিশিন — ফোন করল মস্কোর প্রেস-সেণ্টারে ও বলল:

— ওদের বলবেন, ওরা কামাল করে দিয়েছে!

তারপর আরও কত টেলিফোন, টেলিগ্রাম আর চিঠি। চিঠি-টেলিগ্রামের ভিড় জমে যায় মস্কো আর হিউস্টনে। তবে সংযোজনের পরে ছোট্ট মস্কোবাসী পিওতরই প্রথম টেলিফোন করেছিল। আমাদের কাজে সে সন্তুষ্ট হয়েছে জেনে আমরা সবাই খুবই আনন্দ পেলাম।

১৮ই ও ১৯শে জুলাই মিশ্রিত মার্কিন-সোভিয়েত চালকদল যৌথ গবেষণা পরিচালনা করে 'অ্যাপলো' ও 'সয়ুজে'। ১৯শে জুলাই অপরাহ্ণে আমাদের মহাকাশযানগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আবার সংযোজিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২১শে জুলাই সোভিয়েত মহাকাশযানের অবতরণ যন্ত্রটি এসে নামে আর্কালিক শহরের ৫৪ কিলোমিটার উত্তর-পূবে, আর ২৫শে জুলাই মার্কিন মহাকাশযানটি অবতরণ করে প্রশান্ত মহাসাগরে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে।

মহাকাশযান থেকে পৃথিবীর দৃশ্য

'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' কিসের জন্যে?

আমাদের অভিযানটি কেমন চলল ও তখন আমরা কী করলাম — এ সমস্তকিছু তুমি যাতে বুঝতে পার সেজন্যে আমি তোমাকে প্রথমেই বলব, কেন দরকার হল সোভিয়েত-মার্কিন গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযানের।

মনে কর, তোমার এক বন্ধু বিপদে পড়েছে। তখন তুমি কী করবে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার যন্ত্রণা দেখবে? না, তুমি অবশ্যই তার সাহায্যে এগিয়ে যাবে।

আজ মহাকাশে যায় শুধু সোভিয়েত আর আমেরিকান মহাকাশচরেরা। তবে তা শুধু আজ। কাল গ্রহ-নক্ষত্রে যাবে অন্যান্য দেশের মহাকাশযান। কোন এক মহাকাশযানে যদি দুর্ঘটনা ঘটে, তখন পৃথিবীর মানুষের কী করা দরকার? তুমি বলবে: একখানি উদ্ধার-যান পাঠিয়ে দিলেই হয়, যারা বিপদে পড়েছে তারা ওতে বসেই পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

তুমি ঠিকই বলেছ, বন্ধু। সারা দুনিয়ার মানুষই ঠিক তা-ই ভাবে, কেননা সাধারণ মানুষ বাঁচতে চায় শান্তিতে, তারা চায় পরস্পরকে সাহায্য করতে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দু'টি বড় দেশ। তারা যদি মিলেমিশে শান্তিতে বাস করে তাহলে সারা দুনিয়ারই মঙ্গল, — সবাই তখন শান্তিতে থাকবে।

আর শান্তি চাই সব জাতির। আমরা — সোভিয়েত দেশের লোকেরা — ভালই জানি, যুদ্ধ মানুষকে এনে দেয় কত দুঃখ-দুর্দশা। গত যুদ্ধে একমাত্র আমাদের দেশেই নিহত হয় দুই কোটি ছেলেমেয়ে, নরনারী। আর ফ্যাশিস্টদের বাধানো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ হারায় মোট ৫ কোটি লোক।

সবকিছুই আমাদের মনে আছে। আমরা চাই না যে পৃথিবীতে আবার যুদ্ধ বাধুক, আমরা চাই না যে গোলাগুলিতে নিহত হোক নিরীহ নির্দোষ মানুষ। তবে তার মানে এ নয় যে আমরা কাউকে ভয় করি। না, আমরা কাউকে ভয় করি না। আমাদের দেশ খুব শক্তিশালী ও ধনী। কিন্তু সে-ই হচ্ছে প্রকৃত শক্তিশালী যে দুর্বলকে করে সাহায্য, আর সে-ই ধনী যে গরিবের সঙ্গে ভাগাভাগি করে তার সম্পদ।

আমরা চাই, পৃথিবীর ছোটবড় সব জাতি শান্তিতে থাকুক ও কাজ করুক, তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে মানুষ হয়ে উঠুক, তারা স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর হোক। আমরা —

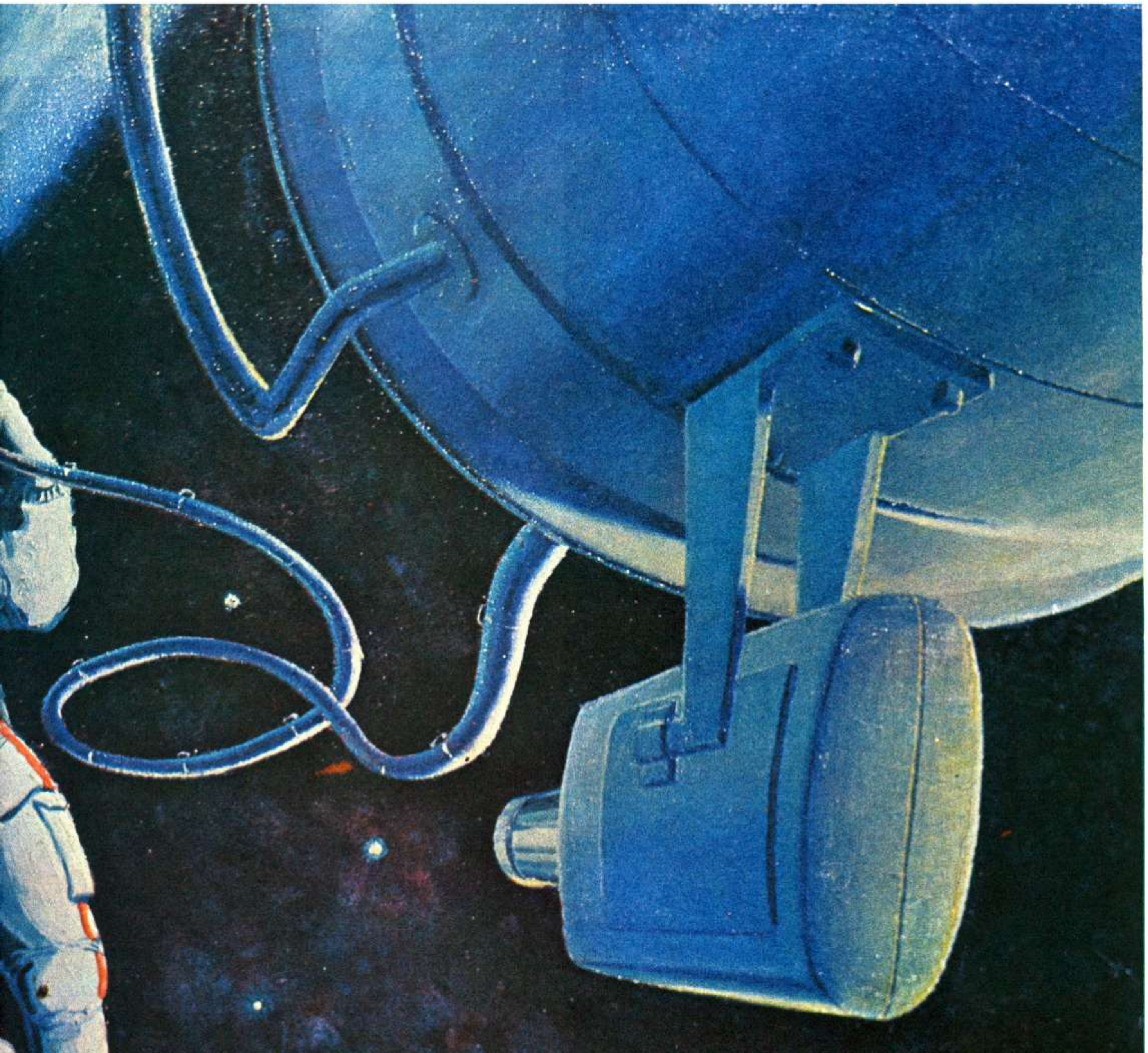

মহাজাগতিক চিত্রগ্রহণ

সোভিয়েত দেশের লোকেরা — চাই, পৃথিবীতে অভাব-অনটন দূর হোক এবং সব জাতি সুখে বাস করুক।

আমেরিকার সাধারণ মানুষও তা-ই চায়, তা-ই চায় অন্যান্য জাতি। বন্ধু-মহাকাশচরদের সঙ্গে আমি যখন আমেরিকায় গেলাম, ভাল করে জানতে পারলাম আমেরিকার মানুষকে। আমেরিকানরা খুবই বন্ধুভাবাপন্ন, অতিথিপরায়ণ জাতি, অমায়িক তাদের ব্যবহার। এ ব্যাপারে তারা আমাদের রুশীদের মতই। আমেরিকানরা সুখে-সাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে ভালবাসে। তারা খুব পরিশ্রমী জাতি। তারা সুন্দর কাজ করে, কাজে তাদের ভাল রুচিবোধ। কিন্তু তারা ছোটবেলা থেকেই টাকা-পয়সা রোজগারে অভ্যস্ত, আর আমাদের ছেলেমেয়েরা টাকা-পয়সা চেনে বড় হলে।

বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়র আর কারিগরদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। অবসর সময়ে আমরা বেড়াতে যাই কৃষক, জেলে আর কাও-বয়দের কাছে। তাদের সঙ্গে বসে আমরা গল্প করি, আলোচনা করি আমাদের দুই জনগণের মধ্যে মৈত্রীর বিষয়েও। যাদের সঙ্গেই আমাদের দেখা হয়েছে তাদের সবাই সোভিয়েত দেশ ও সোভিয়েত জনগণের খুব প্রশংসা করেছে।

মহাকাশ বিজয়ে আমরা ও আমেরিকানরা অনেক সাফল্য অর্জন করেছি। সোভিয়েত দেশই সর্বপ্রথম মহাকাশে প্রেরণ করে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ ('স্পুৎনিক'), এবং আমাদের সোভিয়েত নাগরিক ইউরি গাগারিন হন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচর। আর চাঁদে প্রথমে পৌঁছয় আমেরিকানরা। আমরা আর আমেরিকানরা রকেট পাঠাই শুক্র ও বুধ গ্রহে। আমরা আর আমেরিকানরা তৈরি করি বড়-বড় মহাকাশ স্টেশন, — ওগুলোতে লোকে থাকতে ও কাজ করতে পারে অনেকদিন।

মহাকাশ অভিযান আজও জটিল, ব্যয়বহুল ও বিপজ্জনক ব্যাপার। এইজন্যেই আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ একটি বোঝাপড়ায় এসেছেন, এবং তা হল — মহাকাশ বিজয়ে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করব। এরূপ পারস্পরিক সহায়তার ফলে শুধু রাশিয়ান আর আমেরিকানরাই লাভবান হবে না, লাভবান হবে দুনিয়ার সমস্ত জাতি।

এ হল একটা দিক। অন্য দিকটা হচ্ছে — মহাজাগতিক রহস্যোদ্ধার। এখানেও একসঙ্গে কাজ করা ভাল, আলাদাভাবে নয়, — কারণ ভবিষ্যতে তুমি যখন অন্যান্য গ্রহে যাবে, সেখানকার বাসিন্দাদের মোটেই জানার দরকার হবে না কে এসেছে তাদের কাছে — রুশী না আমেরিকান। আমাদের অজ্ঞাত এই প্রাণীদের কাছে আমাদের একই পরিচয় — আমরা পৃথিবীর মানুষ: সবারই দুই হাত ও দুই পা, দুই চোখ ও দুই কান, এক মুখ ও এক নাক। তাই নয় কি?

পৃথিবী-সান্নিধ্য কক্ষে যদি কয়েকটি স্টেশন-কারখানা নির্মাণ করা যায় তাহলে সারা মানবজাতির কী উপকারটাই না হবে! এই সমস্ত স্টেশন-কারখানায় তৈরি করা যাবে মানুষের প্রয়োজনীয় এমন বহু জিনিস, যা পৃথিবীতে তৈরি করা সম্ভব নয়, কেননা এখানে রয়েছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। তবে এরূপ স্টেশন-কারখানা গড়ার জন্যে চাই অনেকগুলি দেশের সম্মিলিত প্রয়াস। এর সঙ্গে যোগ কর আবহাওয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তৈল, কয়লা, লৌহ আকরিক ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান কার্য, যোগ কর আমাদের পরিবেশ প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে মহাকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ এবং আরও কতকিছু যার কোন ইয়ত্তা নেই। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া এইসব কাজ সম্পূর্ণ অসম্ভব...

এক কথায়, ঝগড়া-ঝাঁটি করে থাকার চেয়ে শান্তিতে বসবাস করার কারণই মানুষের বেশি।

মহাকাশ হচ্ছে এমন অন্যতম ক্ষেত্র যেখানে মানুষের রয়েছে একসঙ্গে কাজ করার মত সুযোগ। এই জন্যেই দরকার হয়েছে 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' মহাকাশ অভিযানের এবং এই জন্যেই সোভিয়েত ও মার্কিন জনগণ সারা দুনিয়াকে দেখাতে চেয়েছে সফল সহযোগিতার উদাহরণ — মিলেমিশে থাকলে আমরা কী বিপুল সাফল্য অর্জন করতে পারি!

কীভাবে তৈরি হয় মহাকাশযান

গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযান কর্মসূচির জন্যে সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা বেছে নেন দু'টি মহাকাশযান — 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলো'। গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযানের কর্মসূচি অনুসারে 'অ্যাপলোর' কাজ ছিল 'সয়ুজকে' খুঁজে পাওয়া ও তার কাছে যাওয়া, তাই তাকে নাম দেওয়া হল 'সক্রিয় মহাকাশযান', আর 'সয়ুজকে' নাম দেওয়া হল 'অক্রিয় মহাকাশযান', কারণ তার কাজ ছিল আপন কক্ষে 'অ্যাপলোর' অপেক্ষা করা। যৌথ অভিযানের জন্যে আমেরিকানরা যদি 'জেমিনি' মহাকাশযান (এর জ্বালানি ধারণের ক্ষমতা 'সয়ুজের' চেয়ে কম) প্রেরণের প্রস্তাব তুলত তাহলে কক্ষপথে প্রথমে 'জেমিনিকেই' পৌঁছে দেওয়া হত ও তখন আমরা তাকে বলতাম 'অক্রিয় মহাকাশযান'। তার পিছু পিছু যাত্রা শুরু করত 'সয়ুজ' ও মহাকাশে সে 'জেমিনিকে' খুঁজে বের করত, ফলে সে হত 'সক্রিয় মহাকাশযান'।

তবে মহাকাশযানের নাম নিয়ে আসল অসুবিধা নয়: নাম যাই হোক উভয় ক্ষেত্রেই দুই মহাকাশযানের চালকদলের পক্ষে যা সবচেয়ে জরুরি ছিল তা হল বিপুল জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা যাতে মহাকাশে সংযোজন সফল হয়। অভিযান কর্মসূচিতে এমনকি এরূপ নির্দেশও ছিল: এক মহাকাশযান থেকে অপর মহাকাশযানে আসা-যাওয়া করার সময় যদি কোন শঙ্কাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাহলে 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলোর' চালকবৃন্দ নিজ নিজ জায়গায়ই অবস্থান করবে (অর্থাৎ বিপদ দেখা দেওয়ার সময় যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে) এবং মহাকাশযানদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে চালকদের নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে পৃথিবীতে অবতরণ করবে। ধর, আমি রয়েছি 'অ্যাপলোতে', এমন সময় বিপদ দেখা দিল, তখন আমি 'অ্যাপলোতে' করেই নামতে পারতাম প্রশান্ত মহাসাগরে, আর টমাস স্ট্যাফোর্ড এমতাবস্থায় 'সয়ুজে' করে অবতরণ করত আর্কালিক শহরের কাছে।

তুমি অবশ্য জান যে মহাকাশে শঙ্কাজনক কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি এবং 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' মহাকাশ অভিযানের কর্মসূচিটি আমরা পুরোপুরিভাবেই সম্পাদন করেছি।

মহাকাশযানের প্রস্তুতিতে প্রধান অসুবিধাটি ছিল মহাকাশচরদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা নিয়ে, কেননা আমরা আর আমেরিকানরা শ্বাস নিতাম বিভিন্ন বাতাসে। আমাদের মহাকাশযানে মহাকাশচররা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায় সাধারণ চাপমাত্রায় সাধারণ বাতাসে, যেন একেবারে অবিকল সমুদ্রতীরের হাওয়ায়। আর আমেরিকানরা নিজেদের মহাকাশযানে সে কাজ সম্পন্ন করে সেমি-সলিড অক্সিজেনের সাহায্যে। ব্যাপারটা হল এই যে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ও মার্কিন পদ্ধতি অদ্যাবধি বিকশিত হয়েছে পৃথক-পৃথকভাবে, এবং আমেরিকানরা প্রথম দিকে তাদের মহাকাশযানগুলিকে খুবই হালকা করতে চেষ্টা করে। তাই তারা স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তে সেমি সলিড অক্সিজেনের আশ্রয় নেয়। ওজনে আমেরিকানরা দাঁও মারল বটে, তবে অম্লজান কিন্তু একদিক দিয়ে বিপজ্জনক: সামান্য স্ফুলিঙ্গেই মহাকাশযানের ভেতরকার সমস্তকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে।

তাছাড়া আরও একটি অসুবিধা ছিল। তা হল — এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশযানে যাওয়ার সময় বায়ুমণ্ডলের তীব্র পরিবর্তন হেতু সম্ভাব্য জখমের হাত থেকে মহাকাশচরদের কীভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হবে? প্রথমে মনে হল, 'অ্যাপলোর' বায়ুমণ্ডলকে বদলে ঠিক 'সয়ুজের' বায়ুমণ্ডলের মত করে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তা করতে গেলে 'অ্যাপলোর' ভেতরে চাপমাত্রা বাড়াতে হত, আর এর ফলে দুর্বল হয়ে পড়ত মহাকাশযানের খোল। দুর্বল খোলের মহাকাশযানে অন্তরিক্ষ অভিযান খুবই বিপজ্জনক। মহাকাশযান দু'টির মধ্যে অবশ্য একটি ট্রাঞ্জিশনেল স্লুজ (অতিক্রমণ নলিকা) বসানো যেত, এবং তারপর মহাকাশচরকে সেই স্লুজের ভেতরে গিয়ে আটটি ঘণ্টা কাটালেই সব ঝামেলা যেত মিটে, — মানুষের রক্তে যে-দ্রবীভূত নাইট্রোজেন থাকে তা পুরোপুরিভাবে উবে যেতে ঠিক আট ঘণ্টা সময়ই লাগে। তবে স্লুজে আবার দু'টি অসুবিধা। প্রথমত, সুদীর্ঘ আটটি ঘণ্টা স্লুজে বসে থাকা অত্যন্ত ক্লান্তিকর, দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে যদি কোন মহাকাশযান দুর্ঘটনায় পতিত হয়, তখন কী হবে? অন্য মহাকাশযান অবশ্যই তার সাহায্যে ছুটে যাবে, কিন্তু তখন আট ঘণ্টা তো দূরে থাক, ত্রাণকার্যের জন্যে এমনকি কয়েকটি মিনিটও অপেক্ষা করা যাবে না।

আরও একটি উপায় ছিল। তা হল স্লুজের কথা ভুলে যাওয়া এবং সোভিয়েত ও মার্কিন মহাকাশচরদের একই মহাজাগতিক পোশাক পরিয়ে দেওয়া, —১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে 'ভসখোদ-২' মহাকাশযানে উড্ডয়নের সময় যে পোশাক পরে আমি খোলা মহাকাশে বেরিয়েছিলাম এই পোশাকটিও হবে অনেকটা সে রকমই। পোশাকটি খুবই

আরামের, খোলা মহাকাশের পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে বাস ও কাজ করার জন্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত সুবিধাই তাতে আছে। তবে খোলা মহাকাশে যা ভাল, মহাকাশযানের ভেতরেও যে তা হামেশা ভাল হবে এমন কোন কথা নেই, — এরূপ পোশাক পরে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে খুব একটা আলাপ-সালাপ করা যায় না। এমনকি মামুলি কথাও তখন বলতে হবে বেতারে।

এই জটিল সমস্যা সমাধানেরও একটি উপায় খুঁজে পেলেন বিজ্ঞানীরা। এর জন্যে তাঁরা কমিয়ে দিলেন 'সয়ুজের' অভ্যন্তরীণ চাপমাত্রা, আর মহাকাশচরেরা যাতে নিদ্রাবেশে অভিভূত না হয় সেজন্যে অক্সিজেনের পরিমাণ দিলেন বাড়িয়ে। 'সয়ুজের' ভেতরের চাপমাত্রা এখন আর সমুদ্রতীরের চাপমাত্রার মত নয়, তা ৩,০০০ মিটার উঁচু পর্বতচূড়ার চাপমাত্রার সমান, তবে তাতে অক্সিজেনের পরিমাণ কিন্তু সমুদ্রতীরের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি। এবার নির্ভয়ে এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশযানে আসা-যাওয়া করা যাবে, কারণ মহাকাশচরদের রক্তে নাইট্রোজেন 'টগবগ করে ফুটতে শুরু করবে' বলে যে ভয় ছিল তা আর নেই।

তবে বন্ধু, এখানেও কিন্তু আমাদের 'দুর্গতির' শেষ হল না। তুমি-আমি জানি, কোন্ মহাকাশযান মহড়া চালাবে মহাকাশে, আর কোন্‌টি — মহড়া সমাপ্তির অপেক্ষা করবে। আমরা এও জানি, সঙ্কট দেখা দিলে কাকে কোথায় থাকতে ও পৃথিবীর কোন্ অংশে অবতরণ করতে হবে। আমরা আরও জানি, এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশযানে বেড়াতে যেতে হলে মহাকাশযান দু'টির বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে কীরূপ 'আচরণ' করা দরকার। কিন্তু পরস্পরের কাছে যাওয়া-আসা করার জন্যে কী ধরনের ব্যবস্থা থাকা চাই?

সর্বাগ্রে বলব যে আমাদের ও আমেরিকানদের মহাকাশযানে প্রবেশ ও তা থেকে নির্গমের জন্যে ডকিং অ্যাসেমব্লি (সংযোজন গ্রন্থি) কখনই এক ধরনের ছিল না। যেমন, আমাদের মহাকাশযানে রয়েছে নিজস্ব ডকিং অ্যাসেমব্লি, যার মধ্য দিয়ে 'সয়ুজ' মহাকাশযান থেকে যাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক কক্ষ-স্টেশন 'সাল্যুত'-এ, আর আমেরিকানদের — ভিন্ন ডকিং অ্যাসেমব্লি, তার মধ্য দিয়ে তারা পরিবহন-যান থেকে গেছে 'স্কাইল্যাব' স্টেশনে। এই ডকিং অ্যাসেমব্লিগুলির প্রতিটি নিজ নিজ মহাকাশযানেরই উপযোগী, তবে 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' অভিযান কর্মসূচির পক্ষে তা ছিল সম্পূর্ণ অকেজো। তখন ডকিং অ্যাসেমব্লি ও ট্রান্সিশনেল স্লুজ গড়ার ভার নিলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

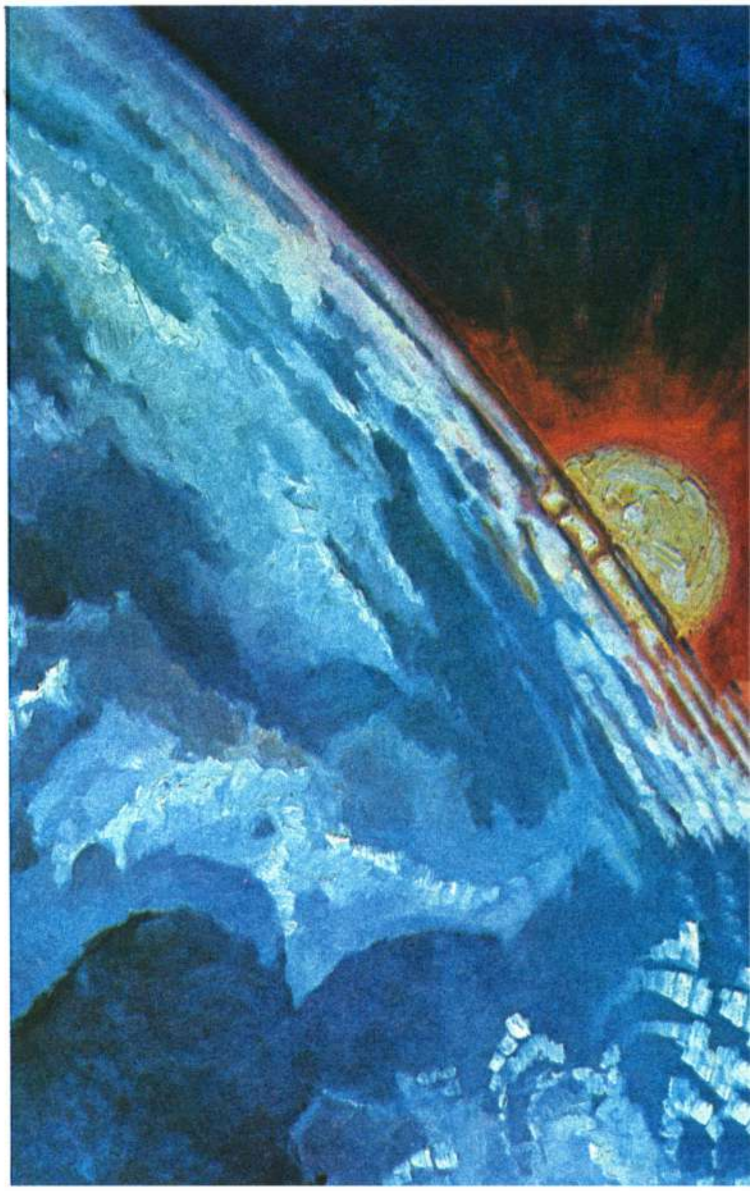

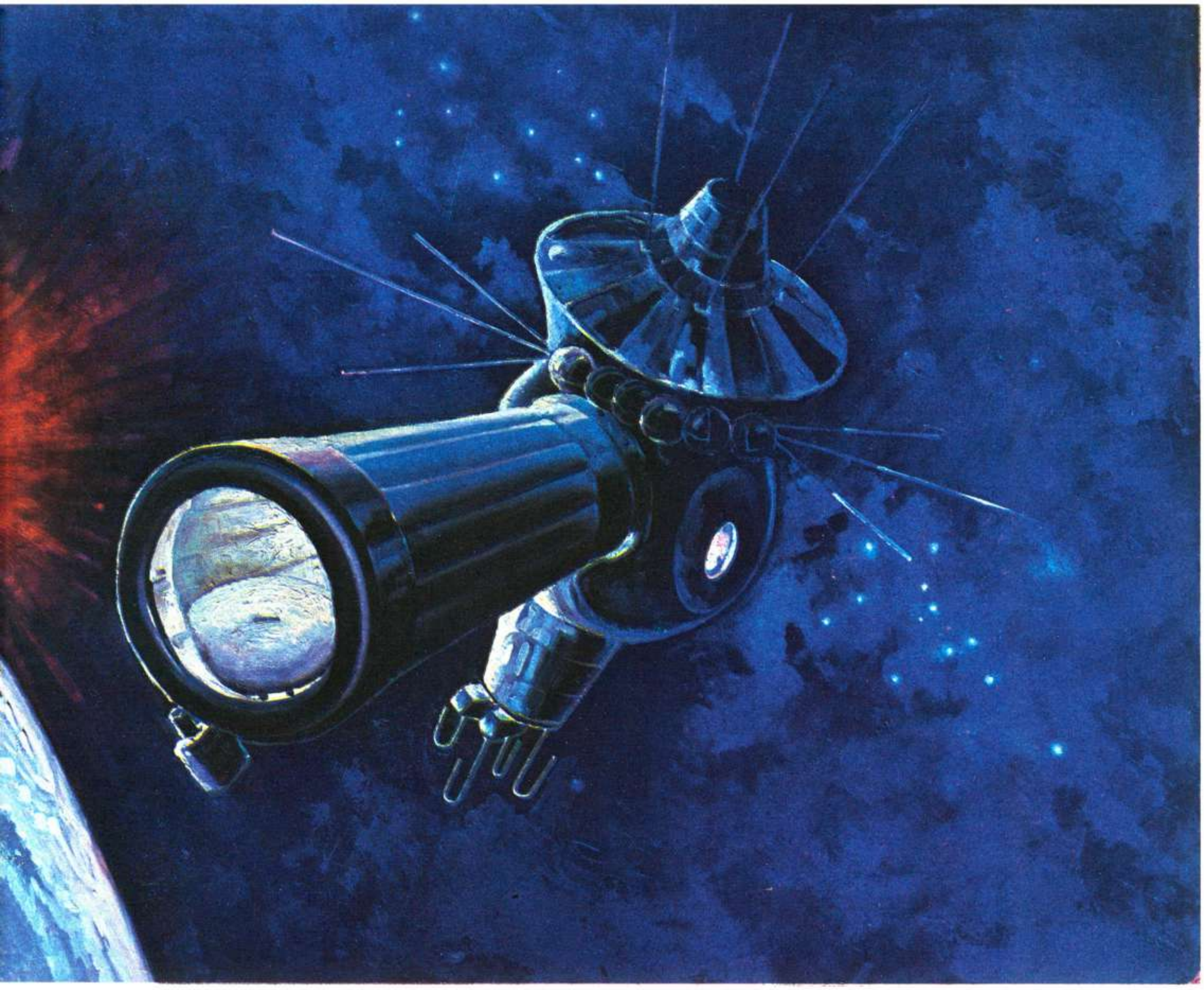

মহাকাশযান 'ভসখোদ-২'

আর সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এদিকে মন দিলেন 'সয়ুজের' অভ্যন্তরীণ বায়ুমণ্ডল 'গড়ার' কাজে, তাকে তাঁরা খাপ খাওয়াতে লাগলেন 'অ্যাপলোর' বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে।

ডকিং অ্যাসেমব্লির নক্সা বানানো হল বটে, তবে দেখা দিল নতুন এক সমস্যা: মহাকাশযান দু'টি খাড়াভাবে না এসে যদি সামান্যও তেরচাভাবে পরস্পরের নিকটস্থ হয় তাহলে কী করা? তখন ডকিং অ্যাসেমব্লি যে কাজই করবে না! তাছাড়া আরও এক ঝঞ্ঝাট: 'সয়ুজ' আর 'অ্যাপলো' মহাকাশযান দু'টির ওজন এক নয়। তারা যদি এমনকি খাড়াভাবেও নিকটস্থ হয়, তাহলে মহাকাশে তাদের আচরণ কেমন হবে?

এক কথায়, ঝামেলা ছিল মেলা। সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের প্রচুর খাটতে হয়েছে এবং তাঁরা খেটেছেন খুব মিলেমিশে। তাঁরা সাহায্য করেছেন পরস্পরকে, একসঙ্গে ভেবেছেন, প্রকৃতির ওপর 'বাটপাড়ি করে' কীভাবে এমন এক ডকিং অ্যাসেমব্লি গড়া যায় যা যেকোন পরিস্থিতিতেই ভাল কাজ করবে, তাঁরা একসঙ্গে খুঁজেছেন কক্ষপথ যেখানে 'সয়ুজ' আর 'অ্যাপলোর' মিলন ঘটানো যাবে সবচেয়ে সহজে এবং তখন মহাকাশযান দু'টি পরিণত হবে দুই ঘরের একটি বাড়িতে ও মহাকাশচরেরা অনায়াসে পরস্পরের কাছে বেড়াতে যেতে পারবে। তবে এই বাড়ির দুই ঘরের মধ্যে চলাফেরার কোন উঠোন ছিল না; উঠোনের বদলে বিজ্ঞানীরা আমাদের জন্যে তৈরি করে দেন ৩·২ মিটার দৈর্ঘ্য ও দুই মিটারের চেয়ে সামান্য কম ব্যাসের একটি সংযোজন পথ — ডকিং মডিউল। এরই ভেতর দিয়ে আমরা যাওয়া-আসা করতাম এক মহাকাশযান থেকে অন্য মহাকাশযানে।

বেশ মজার ব্যাপার, তাই না? তুমি কী বল?

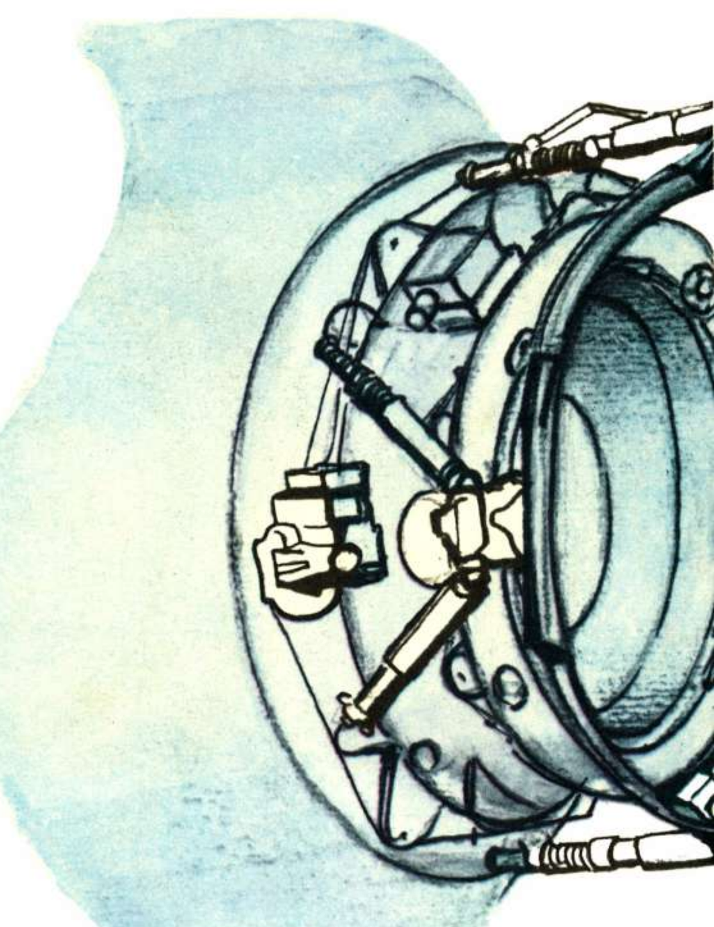

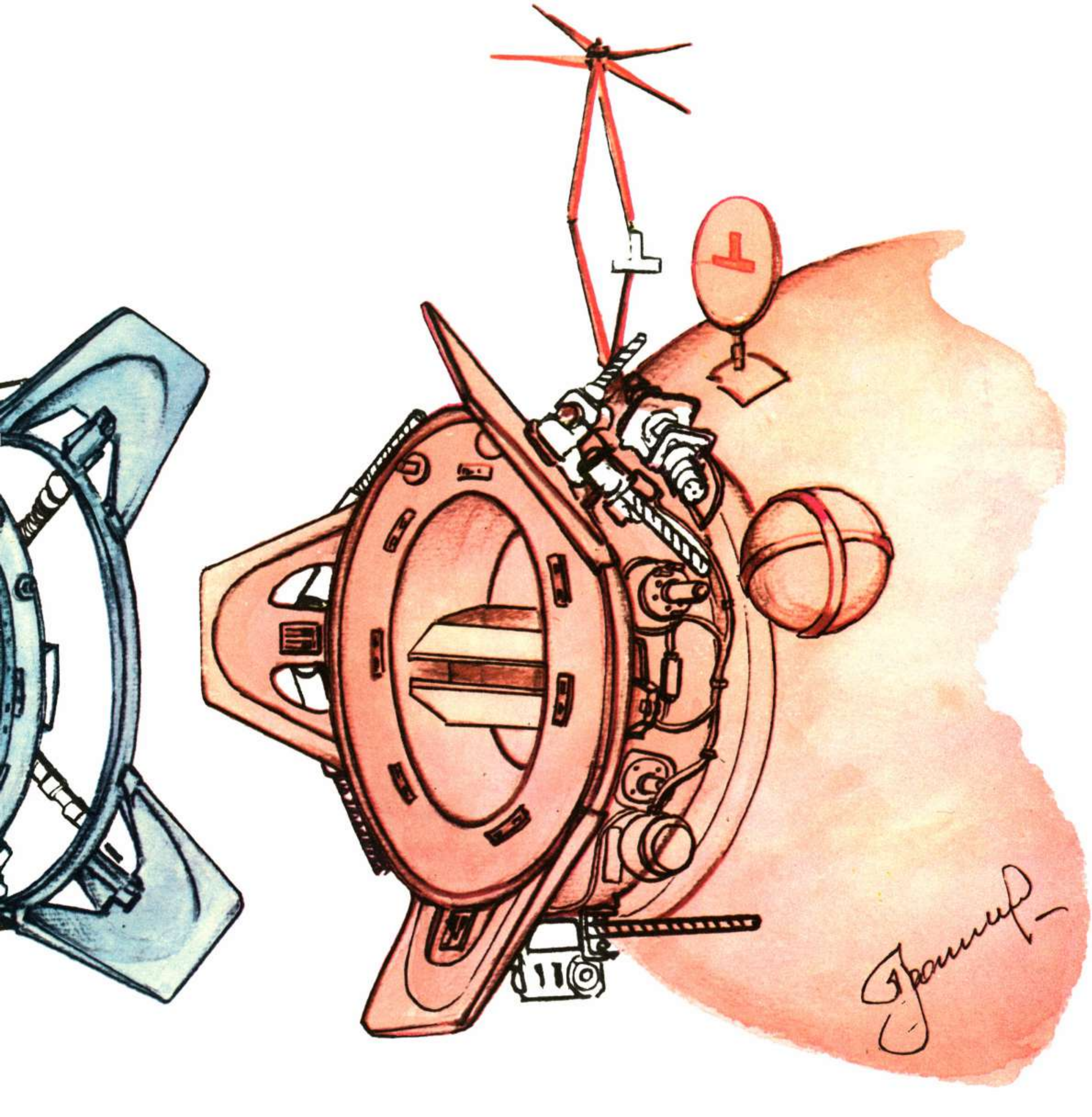

মহাকাশ অভিযানের প্রস্তুতি

প্রতিটি মহাকাশ অভিযানই এক একটি বিরাট ব্যাপার — তাতে অংশ নেয় শত-শত, আর কখনও হাজার-হাজার বড়-বড় বৈজ্ঞানিক ও উৎপাদনী কর্মিদল। বস্তুত, মহাকাশ অভিযানের প্রস্তুতি ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে সারা দেশ, আর 'সয়ুজ'-'অ্যাপলো' যৌথ অভিযানের প্রস্তুতি ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেছে একই সঙ্গে দু'টি দেশ। মহাকাশচরদের ওপর খুব আস্থা রাখা হয়, এবং তাদের সে-আস্থা রক্ষা করা চাই। নিজ কাজ এবং গোটা অভিযান কর্মসূচি সম্বন্ধে মহাকাশচরের থাকা চাই চমৎকার জ্ঞান, আপন অস্তিত্বের সর্বশক্তি দিয়ে তাকে অনুভব করতে পারা চাই, তার অপর সাথী কী করছে, দরকার হলে সর্বদা এগিয়ে যেতে হবে তার সাহায্যে। অভিযানের সঙ্গীকে আপন অস্তিত্বের দ্বিতীয়াংশের মতই অনুভব করার ক্ষমতা থাকা চাই মহাকাশচরের।

তাছাড়া মহাকাশচরকে হতে হয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, জটিলতম পরিস্থিতিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে তাকে স্থির থাকা চাই এবং খুঁজে বের করতে পারা চাই একমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত। এসমস্ত গুণ নিয়ে মানুষ জন্মায় না, তা তাকে আয়ত্ত করতে হয় সুদীর্ঘ প্রয়াসে — দেহ ও মনকে গড়ার ভেতর দিয়ে।

এসো, এবার আমারই জীবনের একটি ঘটনা বলি। তখন আমি তরুণ মহাকাশচর, একবারও মহাকাশে যাই নি, তবে যাওয়ার জন্যে অবিরাম তৈরি হচ্ছিলাম। ভাবী মহাকাশচরের বাধ্যতামূলক প্রস্তুতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়: তালিম-যন্ত্রে কাজ (এরূপ যন্ত্রে তালিম নেওয়ার সময় মনে হয় তুমি যেন ঠিক মহাকাশেই রয়েছ), বিভিন্ন বিমানে উড্ডয়ন এবং প্যারাশুটে অবতরণ।

প্যারাশুটে করে লাফাতে আমি ভালবাসি, এবং লাফিয়েছি আমি হামেশাই — কি বিমান বাহিনীতে কাজ করার সময়, কি মহাকাশচরদের দলে আসার পর। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এ কাজে অপ্রত্যাশিত কিছুই ঘটতে পারে না। একদিন আমি তালিম নিচ্ছিলাম একটি নতুন প্যারাশুটে। বিমান থেকে ধীরেসুস্থে লাফ দেওয়ার পর মনে হল প্যারাশুটে যেন কোন গণ্ডগোল আছে। চেয়ে দেখি একটি ফিতে পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে আমাকে উল্টে দিয়েছে এবং আমি উপুড় হয়ে ছুটছি মাটির দিকে। বড় কষ্টে পা'টি ছাড়ালাম বটে, কিন্তু আপদ কি আর কম! পা ছাড়াতেই ফিতেটি আটকে গেল পিঠে। এবার আমি মাটির দিকে উড়ছি কাত হয়ে। সেদিন সত্যিই আমার ভীষণ ফাঁড়া গেছে। ভাববার সময় ছিল না মোটেই, প্রতিটি মুহূর্তই মহামূল্যবান। তখন একটি মাত্র উপায় — পিঠের নিচের পাশ সোজা ক'রে ফিতের ফাঁশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করা। যখন মাটি থেকে মাত্র তিরিশ মিটার ওপরে রয়েছি

সমস্ত শক্তি একত্র করে আমি তা-ই করলাম। ফাঁশ খুলে গেল। অবতরণের জন্যে আমি উপযুক্ত অবস্থান নিলাম।

সবদিক থেকে বন্ধুরা ছুটে এল আমার কাছে। লেওনভ আকাশে কেমন 'তামাশা করে' তা তারা দেখেছে। তাদের

হিউস্টনে শীত

আমি বললাম সবকিছু। মাটিতে তারাও এবার পালা করে এবং পরে সবাই একসঙ্গে এরূপ ফাঁশ খোলার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুই হল না। তখন ঠিক করলাম আমিই দেখিয়ে দেব কীভাবে তা করতে হয়, — আমি তো একবার ফাঁশ খুলেছিই। দু'হাত দিয়ে খুব চেষ্টা করলাম... কিন্তু পারলাম না। নিজেকে এমনকি প্রথমে আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি: মাটি থেকে মাত্র তিরিশ মিটার ওপরে, যেখানে কোন দিক থেকেই সাহায্যের আশা নেই, সেই শূন্যে আমি এই ফাঁশ খুলতে পারলাম, আর এখানে কিনা বন্ধুদের সাহায্যেও তা পারছি না? না, হাজার চেষ্টা করেও কিছুই হল না। শেষ পর্যন্ত হাতুড়িই নিতে হল।

শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে মহাকাশ মণ্ডল গবেষণা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরব্ধ সহযোগিতা কেমন এগুচ্ছে তা মনোযোগ সহকারে অনুসরণ করছিল সোভিয়েত মহাকাশচরেরা। 'সয়ুজ'-'অ্যাপলো' যৌথ মহাকাশ অভিযানে অংশগ্রহণের স্বপ্ন ছিল আমাদের প্রত্যেকেরই। তবে হঠাৎ যখন সত্যিই আমাকে প্রথম চালকদলের কমাণ্ডার হতে বলা হল আমি খুবই বিস্মিত হলাম — এ ছিল আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা।

'আঘাত' সামলে সব প্রথমে আমি কী বলেছিলাম জান? বলেছিলাম:

— বাঃ, কী চমৎকার, কী সুন্দর ও সম্মানজনক এ কাজ, তবে ইংরেজীতে আমি যে একটি শব্দও জানি না!

— ও কিছু না, সামনে দু'বছর দু' মাস, — সান্ত্বনা দেন 'ইণ্টারকস্মস'-এর চেয়ারম্যান আ. ই. ত্সারিওভ।

প্রথম চালকদলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব ভালেরি কুবাসভকেও খুব অবাক করেছিল। মার্কিন মহাজাগতিক প্রকৌশল এবং নতুন চিত্তাকর্ষক কর্মসূচির বিষয়ে রকেট প্রেমিক ভালেরির ছিল গভীর আগ্রহ, কিন্তু ইংরেজীতে সেও ছিল আমারই মত বকলম। স্কুলে-কলেজে ভালেরি বরাবরই জার্মান ভাষা শিখেছিল। পরে ভালেরি নিজেই বলেছিল যে 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযান কর্মসূচির মত এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে তার বেশ ভয়ই করছিল।

মহাকাশ অভিযানের সারা প্রস্তুতি পর্বে আমাদের সোভিয়েত মহাকাশচরদের পক্ষে ইংরেজী বাস্তবিকই ছিল সবচেয়ে কঠিন বিষয়।

মনে আছে, ক্লাসে ঢুকেছি, দেখি: এক শিক্ষক বসে রয়েছেন, বয়সে আমার চেয়ে ১২-১৩ বছরের ছোট। উঠলেন, ইংরেজীতে দিলেন নিজের পরিচয়, অথচ তিনি ষোল-আনা রুশী। তাঁর কাছ থেকে কখনও আমি একটি রুশী শব্দ শুনি নি। তাঁকে দিয়ে রুশী বলাতে কী চেষ্টাটাই না করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, — তিনি ছিলেন পাথরের মত শক্ত। দরকার হলে বড়জোর জিনিসটি দেখিয়ে তার ইংরেজী নাম বলে দেবেন। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! ইংরেজী শব্দ কিছুতেই মাথায় ঢুকে না। নিজেকে শুধু বলি, বোঝা যখন ঘাড়ে করেছ এবার বাপু ঠেলাটি সামলাও। প্রায়ই অনেক রাত অবধি বসে থাকতে হত। তবে পরে যখন আমার মধ্যে বিশ্বাস এল এবং একটু একটু বলতে শিখলাম, তখন আমার আনন্দ কে দেখে! নিজের ইংরেজী নিয়ে বিশেষ বড়াই করব না, শুধু এইটুকুই বলব যে আমাদের রুশ ভাষা শিখতে মার্কিন মহাকাশচরদেরও কম ঝামেলা পোয়াতে হয় নি।

রুশী শব্দ উচ্চারণ করার আগে প্রচুর খাটতে হয়েছে স্ট্যাফোর্ড, স্লেইটন ও ব্রান্ডকে। এ কাজে তারা যে খুব সাফল্য লাভ করেছিল তা আমি বলব না, — আমার বন্ধু টম স্ট্যাফোর্ডের ক্ষেত্রেই কথাটি বিশেষ করে প্রযোজ্য। তার কথায় ওকলাহোমের টান থেকেই গেল, তা থেকে কোন মতেই রেহাই পেল না সে। আমাদের আমেরিকান বন্ধুরাও সম্ভবত কুবাসভ ও আমার ইংরেজী শুনে আনন্দে আত্মহারা হয় নি। তবে যা-ই বল না কেন, আমরা পাঁচজন পরস্পরকে চমৎকার বুঝতে পারতাম আমাদের 'রুস্টন' ভাষায়। আমাদের মিশ্র ইংরেজী-রুশ ভাষাটিকে ঠাট্টা করে আমরা এই নামই দিয়েছিলাম। 'রুস্টন' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে 'রুস্কি' এবং 'হিউস্টন' শব্দ দু'টি থেকে। 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' মহাকাশ অভিযানের প্রস্তুতি কার্যে নিয়োজিত সোভিয়েত ও মার্কিন প্রযুক্তিবিদদের 'রুস্টন' কিন্তু কম ঝামেলায় ফেলে নি। সম্মিলিত তালিমের সময় আমাদের আলাপ-আলোচনা এমনকি সবচেয়ে অভিজ্ঞ দোভাষীদের পক্ষেই অনুবাদ করা সম্ভবপর ছিল না, — আর প্রযুক্তিবিদদের কথা না হয় বাদই দিলাম, তাঁরা তো একবারে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন।

ভাষার বিষয়ে আমি এত বিশদভাবে বলছি এই জন্যে যে মহাকাশ অভিযানের সময় আমাদের 'রুস্টনই' ছিল একমাত্র ডকিং মডিউল যা সংযুক্ত করেছিল হাজার হাজার সোভিয়েত ও মার্কিন বিশেষজ্ঞের বহু মাসের কাজ (এঁরাই 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলোকে' অভিযানের উপযোগী করে তুলেছিলেন)। শেষ পর্যন্ত অভিযানের পরিচালক-মণ্ডলী একটি উপায় বের করলেন: অভিযানের সময় আমেরিকানরা কথা বলবে রুশ ভাষায়, আর রুশীরা — ইংরেজীতে।

১৯৭৩ সালের ১৯শে নভেম্বরে জ্ভিওজ্দনি শহরে

আমাদের পাঁচ মহাকাশচরের সাক্ষাৎ হয়, — এই প্রথম আমরা সকলে একত্রে মিলিত হই। আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা দেখতে পেল রুশ শীতের অঢেল মাধুর্য। তাদের আমরা দেখিয়েছি মস্কো, প্রাচীন রুশ শহর সুজদাল আর ভ্লাদিমির। মহাকাশবিদ্যার জনক কনস্তান্তিন ত্সিওলকভ্স্কির জন্মভূমি কালুগা যাওয়ার পথে টমাস স্ট্যাফোর্ড, ভ্যান্স ব্রান্ড ও ডনাল্ড স্লেইটন গাড়ি থামাতে অনুরোধ করল। তারা নেমে পড়ে ছোট ছেলেমেয়ের মত খেলতে শুরু করে দিল, ছুঁড়তে লাগল বরফের গোলা।

তুষার সত্যিই মানুষের জন্যে নিয়ে আসে অফুরন্ত আনন্দ। গত ১০-১২ বছরে হিউস্টনে তুষারপাত হয়েছে মাত্র একই বার, তাও কুল্লে পাঁচ সেন্টিমিটার পুরু, বেশি নয়। এতেই গাড়িঘোড়া বন্ধ হয়ে যায়, শিশুরা করে স্কুল কামাই, — তুষারে অভ্যস্ত হতে হবে তো। আর আমাদের রাশিয়ার সর্বত্র তুষার, তুষার আর তুষার! তাই তো মার্কিন মহাকাশচররা শিশু বনে গেল।

ভালেরি আর আমিও দাঁড়িয়ে থাকি নি, আমেরিকানদের সঙ্গে যোগ দিলাম। তুষারের ভাল গোলা বানানো ও তা নিশানায় ছোঁড়া অত সহজ নয় কিন্তু, এ সবকিছুও শিখতে হয়। আর শিখতে শিখতে আবার নিজের মুখও বাঁচানো চাই, পাছে গোলা এসে লাগে!

সোভিয়েত ও মার্কিন মহাকাশচররা শিশুদের খুব ভালবাসে। জান, তারা নিজেরাই অনেকটা শিশুর মত, — অবশ্য সর্বদা তারা একথা স্বীকার করে না। তবে আমি এতে খারাপ কিছু দেখি না। তালিম নেওয়ার সময় আমরা প্রচুর খেটেছি, ভাল করে জেনেছি 'অ্যাপলো' আর 'সয়ুজকে', আর অবসর সময়ে দেখেছি শিশুদের হাস্য-রসাত্মক ছায়াছবি। সারা দুনিয়ার শিশুরা এই ধরনের ছবি ভালবাসে। সোভিয়েত শিশু হাস্য-রসাত্মক ছবিগুলির মধ্যে আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের বিশেষ পছন্দ হয়েছে 'দাঁড়া দেখাচ্ছি' ও 'ব্রেমেনের গায়ক'। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তারা বসে থেকেছে পর্দার সামনে, চিন্তিত হয়েছে ফুর্তিবাজ খরগোশের জন্যে যার পেছনে ধাওয়া করেছে ভীষণ লোভী ও চতুর এক নেকড়ে, আর খরগোশ যখন বরাবরকার মত বিজয়ী হয়েছে তারা হেসেছে আনন্দে।

ভাষা শিক্ষায় আমরা ও আমেরিকানরা সময় সময় কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি বটে, তবে প্রকৌশলের ক্ষেত্রে সবকিছুই ছিল একেবারে সহজ। আমাদের পছন্দ হয়েছে মার্কিন মহাকাশযান 'অ্যাপলো', আর আমেরিকানদের পছন্দ হয়েছে আমাদের 'সয়ুজ'। একসঙ্গে আমরা কাজ করেছি তালিম-যন্ত্রে, এবং কাজ করেছি এমনভাবে যেন আমরা মহাকাশে রয়েছি, — অতিচাপ আর ওজনহীনতাই শুধু ছিল না। সোভিয়েত ও মার্কিন মহাকাশচরেরা 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলো' মহাকাশযান দু'টিকে এত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেনেছে যে আমাদের যেকোন একটি মহাকাশযানে কাজ করতে বাধা হয় নি। ফলে দরকার হলে আমরা কাজ করতে পারতাম পরস্পরের পরিবর্তে কিংবা মিলিতভাবে।

আমেরিকানদের সঙ্গে কাজ করে আরাম আছে। চমৎকার দিলদার লোক তারা। সাহসীও বটে। আমাদেরই মত তারাও ভালবাসে ঠাট্টা-তামাসা এবং নিজেরাও ঠাট্টা-তামাসা করতে জানে।

টমাস স্ট্যাফোর্ড অভিযোগ করেছিল মাত্র একই বার। আমাদের মিলিত প্রস্তুতির একটি ধাপ তখন শেষ হয়েছে। মার্কিন বন্ধুরা দেশে ফিরে যাবে। আমাদের মহাজাগতিক আহারের সঙ্গে পরিচিত হয়ে স্ট্যাফোর্ড বলল:

— সামনে আরও অনেক কাজ, তেমন কোন অসুবিধা দেখছি না। তবে একটি মুশকিল রয়েছে বৈকি। দিলখোলা রুশ আতিথেয়তার পর আমরা এত ভারি হয়ে গেছি যে আমাদের কক্ষপথে পৌঁছানোর জন্যে বাহক-রকেটটির ক্ষমতা এবার বাড়াতেই হবে।

স্ট্যাফোর্ডের এই ঠাট্টার জবাবে ভালেরি কুবাসভ বলল:

— আমাদের বাড়িতে বন্ধুরা এলে তাদের ভাল করে খেতে দিতে হয়, সেটাই নিয়ম। আর মহাজাগতিক বাড়িতে এলে তো কথাই নেই। তাই আগে থেকেই আমরা তোমাদের আপ্যায়ণ করে দেখতে চাই কী কী তোমাদের ভাল লাগে।

কোন খাবার আমেরিকানদের বিশেষ ভাল লেগেছে তা জানা মোটেই সহজ ছিল না: স্ট্যাফোর্ড, স্লেইটন ও ব্রান্ড — সবাই সানন্দে খেয়েছে টিউবে ভরা বাঁধা কপি আর গাজরের সুপ, মাংসের সুপ, বাছুরের মাংস, ঝোল দেওয়া জিহ্বা, কারবোনেট, মধু দেওয়া পিঠা, আর সব শেষে — কালো বেরির রস। রস খাওয়ার আগে টিউবগুলি তারা ঠোকাঠুকি করল, হাসলও খুব।

আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের সঙ্গে সম্মিলিত তালিমে ভালেরি আর আমি সব মিলিয়ে কাটিয়েছি আঠারো সপ্তাহ। এই আঠারো সপ্তাহে অসংখ্য প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধান করেছি আমরা, জেনেছি 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' অভিযানের সূক্ষ্মতম বিষয়গুলি, আর সবচেয়ে বড় কথা — আমরা পূর্ণ সমঝোতায় পৌঁছতে পেরেছি এবং পরস্পরকে সবকিছুতে বিশ্বাস করতে শিখেছি।

টমাস স্ট্যাফোর্ড

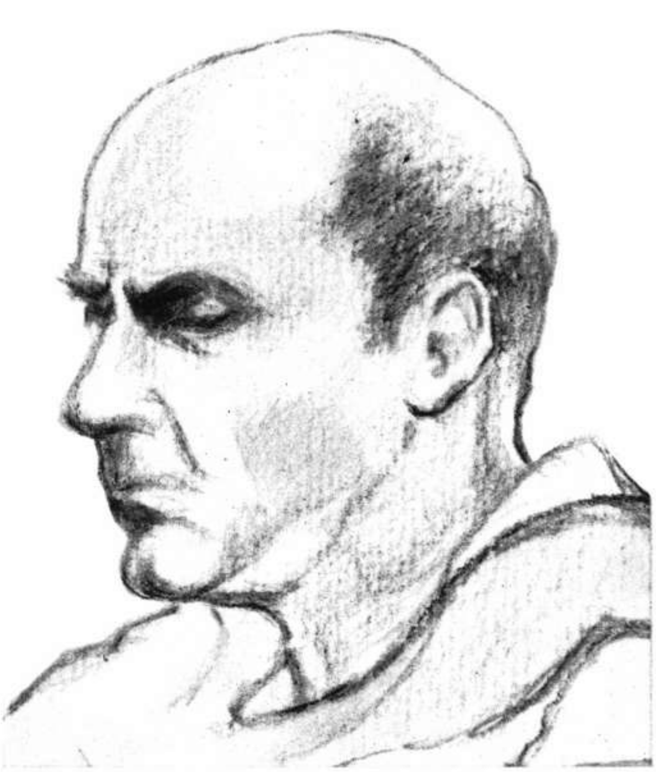

জেনারেল টমাস স্ট্যাফোর্ড নিযুক্ত হল 'অ্যাপলো' মহাকাশযানের কমান্ডার। এই চমৎকার ও নির্ভীক লোকটির বিষয়েই তোমাকে দু' একটি কথা বলছি এবার।

লম্বা ও সুঠাম গড়নের লোক টম। চারবার সে গেছে মহাকাশে। আর কেউ এতবার মহাকাশে যায় নি। মার্কিন মহাকাশচরেরা তাকে বলে 'দামাল', আর 'সম্ভবপর গতি' বৃদ্ধির প্রতি টমের প্রবণতা আমাদের বন্ধুদের কাছে প্রকৃত সাহসী এই লোকটির চরিত্রের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক দিক বলে মনে হল না। মহাকাশে যে এমনিতেই আমরা ভীষণ বেগে উড়ি সেদিকে তার খেয়ালই থাকে না।

সব মার্কিন মহাকাশচরই টমকে 'দাদু' বলে ডাকে, তবে সে কিন্তু অত বুড়ো নয়, তাছাড়া তার কোন নাতি-নাতনীও নেই। আমাদেরই মত তারও অবশ্য ছেলেমেয়ে আছে। মজার ব্যাপার — মার্কিন ও সোভিয়েত মহাকাশচরদের কেন যেন মেয়েই জন্মায় বেশি। তবে জ্ঞানী-গুণীরা তো বলে, দুনিয়ায় মেয়ে যত বেশি অশান্তি তত কম।

স্ট্যাফোর্ডকে 'দাদু' বলা হয় তার উদারতা ও বিচক্ষণতার জন্যে। অন্তত আমি তা-ই মনে করি। সর্বদাই সে ভদ্র ও সহৃদয়। খুব হাসিখুশিও। আমি দেখেছি, মহাকাশযানে সে কীভাবে কাজ করে। এত উদার হয়েও সে তার চালকদলকে মুঠোয় রাখতে জানে, প্রত্যেকেই ভাল জানে তার কী করতে হবে, সবাই কাজ করে খুব সুচারুরূপে, নিজের কাজও স্ট্যাফোর্ড চমৎকার জানে।

স্ট্যাফোর্ডের রয়েছে জোরালো খ্যাতি (প্রসঙ্গত, টম নিজেই 'জোরালো' লোক: সে কথা বলে জোরে আর হাসলে কান যায় ফেটে!)। কিন্তু খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও টম খুবই সরল। সরলতা অবশ্য মার্কিন মহাকাশচরদের চরিত্রের অন্যতম বিশিষ্ট গুণ। বিশেষ করে এই জন্যেই তারা আমাদের কাছে এত প্রিয়। আমরা — এবং সম্ভবত দুনিয়ার সব মানুষই — অহংকারী লোকেদের ভালবাসি না। বাইরে থেকে টমকে দেখায় ধীরস্থির ও হিসেবী (টম হামেশাই হিসেব করে দেখে কোন জিনিসের কত দাম, তবে সে কিন্তু মোটেই কৃপণ নয়), ভেতরে সে যেন একটি চাপা স্প্রিং এবং ওড়ার জন্যে তার মধ্যে রয়েছে অদম্য বাসনা, — সে উড়তে চায় আরও বেগে, আরও ওপরে। আজই যদি তাকে একটি নতুন রকেট দিয়ে বলা হয় আলোর বেগে বৃহস্পতিতে উড়ে যেতে, সে সম্ভবত প্রথমে হিসেব করে দেখবে তাতে কত 'খরচ পড়বে', তারপর নিজের সমস্ত ক্ষমতা মেপে দেখবে এবং শেষে রাজি হয়ে যাবে।

'জেমিনি-৬' ও 'জেমিনি-৯' মহাকাশযানে টম দুবার উঠেছিল পৃথিবী-সান্নিধ্য কক্ষে। 'জেমিনি-৯'-এ পৃথিবীতে সে একেবারে ঠিক জায়গায় এসে নামে — অবতরণের জন্যে নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে মাত্র ৬৪০ মিটার দূরে সরে যায় তার মহাকাশযান, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা হল অতি যথাযথ অবতরণ। আর ১৯৬৯ সালে 'অ্যাপলো-১০' মহাকাশযানে টম যাত্রা করে চাঁদের দিকে। এটাই ছিল মানবেতিহাসের প্রথম চন্দ্রাভিযান।

অভিযানটি ছিল 'তথ্য-সংগ্রহমূলক'। এর কর্মসূচিতে চাঁদে অবতরণের কোন কথা ছিল না, — সেটা ছিল অন্যদের কাজ। স্ট্যাফোর্ডের কাজ ছিল: চাঁদে যাওয়া ও চাঁদ থেকে ফেরার পথটি কেমন দেখায় তা 'শুধু' জেনে আসা, 'অ্যাপলো-১১' মহাকাশযানের চান্দ্রিক কক্ষের (লুনার ক্যাবিন) চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের পক্ষে একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করা ও তার ফোটো তোলা।

চমৎকার কাজ করে স্ট্যাফোর্ড। সেরনানের সঙ্গে চান্দ্রিক কক্ষে ঢুকে সে আসল মহাকাশযান থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। আসল যানটিতে থেকে যায় ইয়াং। আপন কক্ষপথে থেকে স্ট্যাফোর্ড আট ঘণ্টা ধরে নিরীক্ষণ করে চাঁদের পাহাড়-পর্বত আর জ্বালামুখগুলি। তখন সে ছিল চাঁদ থেকে মাত্র ১২·৮ কিলোমিটার ওপরে। এরূপ উচ্চতায় পৃথিবীর ওপর আজ চলাচল করে যাত্রীবাহী বিমান।

চাঁদে অবতরণ ও চাঁদ থেকে ওড়ার মহড়া দেয় স্ট্যাফোর্ড। মহড়ার শুরুতেই সে এক অপ্রত্যাশিত অসুবিধার সম্মুখীন হল। আসল মহাকাশযান 'অ্যাপলো-১০' থেকে চান্দ্রিক কক্ষটি পৃথক হতে না হতেই তা ডিগবাজি খেতে লাগল। এরূপ এলোমেলো গতি থামানো এবং চন্দ্র-সান্নিধ্য কক্ষে প্রবেশের জন্যে শুধু প্রকৌশলে চমৎকার জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট নয়, তার জন্যে ইস্পাতের স্নায়ুও প্রয়োজন। স্ট্যাফোর্ডের দুই-ই আছে।

ওড়ার সময় আমি টম স্ট্যাফোর্ডের একখানা ছবি আঁকি। টম তাতে নিজের স্বাক্ষর করে।

ডনাল্ড স্লেইটন

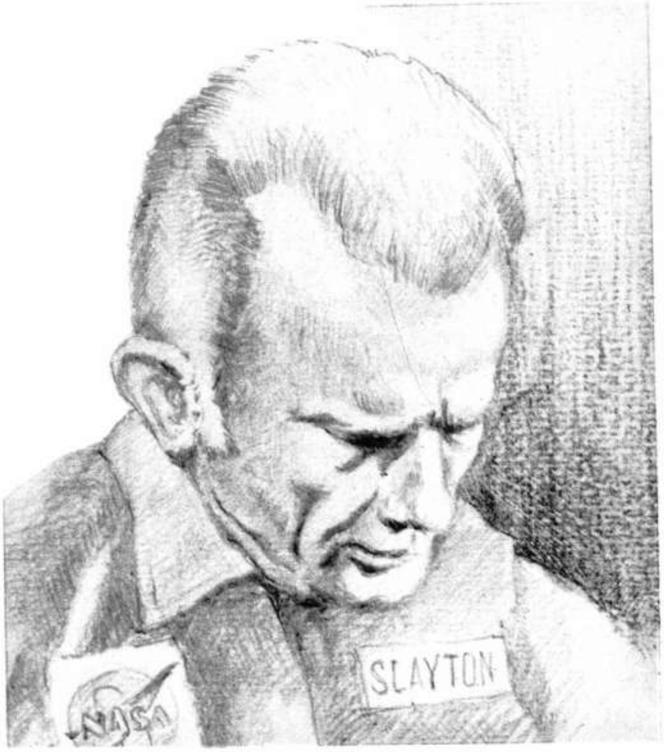

মার্কিন মহাকাশচর দলের কমান্ডার ডনাল্ড স্লেইটনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৬৫ সালে — আন্তর্জাতিক মহাজাগতিক সম্মেলনে। বিচক্ষণতা, স্থৈর্য ও সুন্দর ব্যবহারের জন্যে তখনই ডনাল্ড লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মহাকাশে যাওয়ার জন্যে দশ বছর অপেক্ষা করে ডনাল্ড। তবে 'অপেক্ষা করে' কথাটি বললে ঠিক হবে না। সে কাজ করে। নির্মমভাবে নিজেকে গড়ে তুলে ডনাল্ড, প্রতিদিন দু'মাইল দৌড়য়, খেলাধুলা করে, আর যখন তৈরি হতে থাকে 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' মহাকাশ অভিযানের কর্মসূচি, ডনাল্ড আগেভাগেই রুশ ভাষা শিখতে আরম্ভ করে দেয়, — তখন সে নিজেই জানত না তাকে 'অ্যাপলোর' চালকদলে নেওয়া হবে কিনা।

১৯৫৯ সালে প্রথম যে সাতজন মার্কিন মহাকাশচর মনোনীত হয় তাদের মধ্যে ডনাল্ডও ছিল একজন। তখন আমেরিকায় নির্মিত হত এক-আসনী ছোট্ট মহাকাশযান 'মের্কুরি'। ওগুলিরই একটিতে ওড়ার কথা ছিল ডনাল্ডের। কিন্তু ১৯৬২ সালের ১৫ মার্চ তারিখে নির্দিষ্ট দ্বিতীয় মার্কিন মহাকাশযানের যাত্রার দু'মাস আগে ডাক্তারেরা ডনাল্ডকে অভিযানে যেতে নিষেধ করেন। তার হৃদয়ে কোন গণ্ডগোল ছিল।

ডনাল্ড স্লেইটন হয় মহাকাশচর দলের নেতা মহাকাশযানের চালকদলের মনোনয়ন ও প্রস্তুতির কাজ পরিচালনা করে সে, কিন্তু নিজে উড্ডয়নের প্রস্তুতিতে অংশ নেয় নি। স্ট্যাফোর্ড ও ব্রান্ডকে সে-ই গ্রহণ করেছিল মহাকাশচরদের দলে। ডনাল্ডেরই হাতে গড়া নতুন লোকেরা মহাকাশে যেতে থাকে, শুধু সে-ই একা থেকে যায় পৃথিবীতে। বাড়ে তার বয়স।

কেউ-ই বিশ্বাস করতে চায় নি যে ডাক্তারেরা ডনাল্ডকে কখনও মহাকাশে যেতে দেবেন। শুধু সে-ই তাতে ছিল অটল বিশ্বাসী। সে চলতে লাগল কঠোর নিয়ম মেনে।

ডনাল্ড বলেছে: একবার ভাল করে দৌড় দিলেই আমার হৃদয় ঠিকমত কাজ করতে থাকে। কেন এমন হয় — স্বয়ং ডাক্তাররাও জানেন না। আর ডনাল্ড কখনও অসুস্থ হতে চায় নি, নিজেকে সে বরাবরই সুস্থ মনে করেছে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে — নিষেধ করার ঠিক দশ বছর পরে — ডাক্তাররা ডনাল্ডকে মহাজাগতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে অনুমতি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সে 'সয়ুজ'-'অ্যাপলো' অভিযানের জন্যে তৈরি হতে শুরু করে। আর সে অপেক্ষা করতে চায় না, তর সইছে না তার, শিগগিরই ৫০ বছর...

'সয়ুজ'-'অ্যাপলো' অভিযানের পর মস্কোয় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডনাল্ডকে জিজ্ঞেস করা হয়, কীভাবে সে তার রোগ দমন করেছে। ডনাল্ড জবাবে বলে:

— আমার কোন রোগই ছিল না। আমার দশটি বছর লেগেছে ডাক্তারদের কাছে প্রমাণ করতে যে আমি সুস্থ, কেবল এই যা।

এটা হল ডিন স্লেইটনের প্রতিকৃতি।

ভ্যান্স ব্রান্ড

এই হাসিখুশি লোকটিকে করা হয় 'অ্যাপলোর' কম্যাণ্ডিং মডিউল-এর পাইলট। মহাকাশচরেরা তাকে ভালবাসে ও ভাই ভাবে। তার শিষ্টতা, অকপটতা আর শ্রমশীলতা সবাইকে আকর্ষণ করে। ভ্যান্স খুবই অনুসন্ধিৎসু এবং শিশুদের সে ভালবাসে। চার ছেলেমেয়ে তার। অবশ্য তাদের সঙ্গে তার দেখা হয় কালে-ভদ্রে: প্রচুর কাজ করে সে, প্রচুর তালিম নেয়। টম ও ডনাল্ডের চেয়ে ভ্যান্স ভাল রুশ বলতে পারত। আমাদের মহাকাশচরেরা তাকে দিয়েছিল একটি রুশী নাম — ভানিয়া।

ডনাল্ডের মত ভানিয়াও মহাকাশে যায় এই প্রথম। শৈশব থেকেই সে আকাশের স্বপ্ন দেখেছে। সে উড়েছে জেট ফাইটার বিমানে, পরীক্ষা করেছে নতুন নতুন বিমান আর হেলিকপ্টার।

১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল। ভানিয়া মহাকাশচর হয় নি তখনও। বিশ্বের প্রথম মহাকাশচর ইউরি গাগারিনের অভিযানের কথা স্মরণ করে সে বলে:

— আমি জানতাম যে মানুষ অবশ্যই মহাকাশে পাড়ি জমাবে, কিন্তু যা ঘটল তাতে আমি স্তম্ভিত না হয়ে পারি নি!

১৯৬৬ সালে ভানিয়া মার্কিন মহাকাশচরদের দলভুক্ত হল। পাঁচবার সে তৈরি হয়েছে মহাকাশ অভিযানের জন্যে

কিন্তু তার কপাল খারাপ: প্রতিবারই মহাকাশে গেছে অন্যেরা। সত্যি কী আক্ষেপের কথা, তাই না? কিন্তু ভানিয়া একটুও মন খারাপ করল না, তার দৃঢ় বিশ্বাস রইল, সে একদিন মহাকাশে যাবেই।

আমাদের মিলিত তালিমের সময় কিছুদিন বাইকোনুরে থাকার পর ভানিয়া বলেছিল:

— তোমাদের বাইকোনুর দেখতে অনেকটা আমাদের কালিফোর্নিয়ার এড্রুয়ার্ডস ঘাঁটিরই মত। মহাকাশে তোমাদের ও আমাদের যাত্রা শুরু হয় একই রকম মাটি থেকে। এটা কী চমৎকার!

আর এটাই ভ্যান্স ব্রান্ডের প্রতিকৃতি। তাকেও এঁকেছিলাম মহাকাশে।

মহাকাশচরের হাতে-খড়ি

মহাকাশচর হওয়ার আগে আমি ছিলাম বৈমানিক। বৈমানিক হওয়ার আগে আমি পড়তাম স্কুলে। আর স্কুলে যাওয়ার আগে আমি ছিলাম ছোট্ট একটি ছেলে। তোমারই মত কিংবা তোমার ছোট ভাইয়ের মত। মনে আছে, মেয়েদের বেণী ধরে টানতে খুব ভালবাসতাম আমি। তুমি অবশ্যই বলবে যে মেয়েদের বেণী ধরে টানা ভাল নয় (আর এখন আমি নিজেই তা জানি — আমার দুই মেয়ে আছে), কিন্তু, প্রথমত, আমি এমনভাবে টানতাম যাতে তাদের খুব ব্যথা না লাগে বা তারা না কাঁদে, এবং, দ্বিতীয়ত, তুমি আর আমি যে বন্ধু, আর বন্ধুরা একে অন্যকে হামেশাই সত্যি কথা বলে, তাই না? তাই তো তোমার কাছে আমি স্বীকার করছি যে ছেলেবেলায় মেয়েদের বেণী ধরে টানতে ভালবাসতাম। তারপর যখন একটু বড় হলাম, আমি বুঝলাম যে ভাল ছেলেরা দুর্বলদের ওপর হাত উঠায় না, দুর্বলদের রক্ষা করাই তাদের কাজ, আর সে জন্যে ভাল দৌড়তে পারা চাই, লাফঝাঁপ ও সাঁতার জানা চাই।

কীভাবে আমি সাঁতার শিখি তা-ই এবার বলছি। আমি মানুষ হয়েছি সাইবেরিয়ার কেমেরভো শহরে। আমাদের শহরে একটি পুকুর ছিল। পাড়াপড়শীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রায়ই আমরা ওখানে যেতাম। এমনকি যারা সাঁতার জানত না তারাও যেত, — যেমন আমি। বড় ছেলেমেয়েরা জল ছিটাছিটি করছে, লাফঝাঁপ দিচ্ছে, সাঁতরে গিয়ে একে অন্যকে ধরতে চাইছে। সূর্যের আলোয় ঝকমকিয়ে ওঠে জলের ছাঁট, দেখা যায় রামধনু, আনন্দে ছেলেপিলেরা করে হট্টগোল, — ওঃ, সে কী মজা! আর আমরা যারা সাঁতার জানতাম না তাদের হত হিংসে। সত্যিই তো, অন্যেরা যখন দিব্যি সাঁতার দিচ্ছে তখন কারই বা পারে বসে থাকতে ভাল লাগবে?

তখন আমরা এক বুদ্ধি আঁটলাম: ট্রাউজারের পাগুলি নিচে দিলাম বেঁধে, আর তারপর ভিজিয়ে জলে বাড়ি দিতেই তা উঠল ফুলে। এবার তাতে ভর দিয়ে মন ভরে যত ইচ্ছে সাঁতার দাও।

একবার ছেলেরা আমার সঙ্গে তামাসা করল। আমি যাতে টের না পাই এমনভাবে চুপি চুপি তারা আমার কাছে এল এবং আমার নিচের ফুলানো ট্রাউজারটি ধরে দিল এক টান।

তুমি হয়ত বুঝতেই পারছ তখন আমার কী অবস্থা। জল গিললাম, কিছুক্ষণের জন্যে ডুবে গিয়ে পরে ভেসে

উঠলাম, চোখে অন্ধকার। 'বাঁচাও, বাঁচাও!' — বলে চেঁচালাম। কে আর বাঁচায়! আমি এত দূরে চলে গিয়েছিলাম যে কোন সাহায্য আসার আগেই হয়তো অক্কা পেয়ে যেতাম। ভাবলাম, কারো সাহায্যের আশা যখন নেই, নিজেই নিজেকে বাঁচাতে হবে। এবং সাঁতার দিয়ে পারে পেঁছেও গেলাম।

এই ভাবেই আমি সাঁতার শিখলাম। আজও আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা — দৌড় আর সাঁতার। যতই ব্যস্ত থাকি না কেন প্রতিদিনই আমি দৌড়ই ও সাঁতার দিই। শীত-গ্রীষ্ম বারো মাসই তাই চলে। পাঁচ কিলোমিটার দৌড়ই, ঘামে গেঞ্জি জবজবে হয়ে যায়, আর তারপর পুকুরে আধা কিলোমিটার। কেউ যেন হিসেব করে বলেছিল যে বছরে আমি নাকি দৌড়ই দু'শো ক্রস কান্ট্রি রেসের সমান দূরত্ব, রেসিং সাইকেলে করে পাড়ি দিই প্রায় হাজার কিলোমিটার আর স্কিতে করে যাই দুই শো' কিলোমিটার। সকালে না পারলে কাজের পরে দৌড়ই ও সাঁতার দিই। খেলাধুলা আমার পক্ষে বাতাসেরই মত নিত্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য। জ্‌ভিওজ্‌দনিতে সবাই আমাকে ঠাট্টা করে বলে, আমার অক্লান্তি নাকি ব্যায়াম-শিক্ষকদের ক্লান্ত করে তুলেছে। তা অবশ্য ঠাট্টা। আর সত্যি কথা বলতে গেলে, প্রতিদিনের ট্রেনিংয়ে (এবং এ ছাড়া ভাল মহাকাশচর হওয়া যায় না) আমাকে খুব সাহায্য করে আমার বন্ধুরা — আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা। বাড়িতে তাদের যতই পড়াশোনার কাজ থাকুক না কেন, তারা হামেশাই আমার সঙ্গে পুকুরে যায়। তোমার ছোট বন্ধুরাই যখন খেলাধুলায় এত উৎসাহ দেখায় তখন কি আর চুপচাপ বসে থাকা যায়!

কীভাবে আমি বড় হলাম

যেদিন মা আমাকে প্রথম স্কুলে নিয়ে গেলেন সেদিনই আমি বড় হলাম। সে অনেক দিন আগের কথা, তোমার তখনও জন্মও হয় নি। দেশ আমাদের তখন সবে শক্তি সঞ্চয় করছে, লোকে অভাব-অনটনে দিন কাটাচ্ছে, স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছিল খুবই কম। পাঠ্যপুস্তকের কথা না হয় বাদই দিলাম, — সাধারণ স্কুল-ব্যাগই তখন সব ছেলেমেয়ের কপালে জোটে নি। আর আজ সোভিয়েত দেশের সব ছেলেমেয়েদেরই আছে সুন্দর সুন্দর ব্যাগ।

আমার শহর কেমেরভো সে বছরগুলিতে ছিল বিশাল কয়লা এলাকা কুজবাসের রাজধানী। তবে শুধু এজন্যেই তার খ্যাতি ছিল না; তার খ্যাতির আরেকটি কারণ ছিল তার ফুটপাথগুলি। কেমেরভোর ফুটপাথগুলি তখন দেখবার জিনিস বটে! মসৃণ, প্রশস্ত ফুটপাথ, প্রশস্ত তক্তা দিয়ে তৈরি। এরূপ ফুটপাথে চলার সময় মনে হত যেন ঘরের পার্কেটের ওপর হাঁটছি। শরতের সকালে ফুটপাথগুলি বিশেষ সুন্দর দেখাত, — তা ঢাকা থাকত চকমকে তুষার কণায়। তখন ফুটপাথে তাকালে মনে হত, তা ঝকমক করছে যেন সূর্যালোকে নয়, অসংখ্য শাদা সোনালী নীল তুষার কণায়ও নয়, — যেন ফুটপাথ নিজেই মুক্তার মত চমকাচ্ছে।

আগে থেকেই আমি একটি তেরপলের ব্যাগ তৈরি করে নিই। তাতে ভরে রাখি রঙিন ছবি আঁকা পত্রিকা, আমার সবচেয়ে মূল্যবান ও রঙচঙে সমস্ত জিনিস। সকাল হতেই মা আমাকে নিয়ে যান স্কুলে। যাচ্ছি মায়ের পাশে পাশে, বেশ হাসিখুশি; মনে একটু অহংকারও আছে বৈকি। এক হাতে ধরেছি মাকে, আর অন্য হাতে — রাজ্যির সমস্ত ধন-সম্পদে ঠাসা ব্যাগটির ফিতে, ভয় পাছে কোনকিছু হারিয়ে যায়। মনে হয়, সেপ্টেম্বরের সেই সকালের মত আর কখনও এত সুন্দর দেখায় নি কেমেরভোর ফুটপাথগুলি। ঝকমক করছে তুষার কণা, চোখ টিপছে, আমি বড় হয়েছি বলে সেও যেন আমার সঙ্গে আনন্দ করছে।

যেখানে আমি পা ফেলেছি, সেখানে সূর্যালোকে উজ্জ্বল তুষার কণায় আমার পায়ের ছাপ থেকে ওঠছে ভাপ। পৃথিবীর মাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ — মানুষেরই আপন স্মৃতি। সে স্মৃতি ছোট্ট ও স্বল্পকালীন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা উষ্ণ। আর ওই সকালে সূর্য ছিল অপূর্ব, বিশাল, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে তার বড়-বড় সোনালী রশ্মি। যতই সে ওপরে উঠতে থাকল আমি তার আদর অনুভব করতে লাগলাম। পরে মহাকাশ অভিযানের সময় আমি ঠিক এরূপ সূর্যই দেখেছিলাম এবং স্মরণ করেছিলাম সেপ্টেম্বরের সেই রৌদ্রস্নাত সকালের কথা।

স্কুলের পথে মা ঠিক করলেন আমাকে নাপিতের দোকানে নিয়ে যাবেন — মাথায় হয়েছে ঝাঁকড়া চুল, — কিন্তু আমি জেদ ধরলাম যাব না। জুতোর ডগা দিয়ে চুপি চুপি ঘষি ফুটপাথ, কীভাবে তা থেকে ভাপ ওঠছে ও আমার পায়ের দাগ দৈত্যের পায়ের দাগের মত বিশাল আকার ধারণ করছে তা দেখে হই মুগ্ধ। এক জায়গায় গলছে তুষার কণা, আমি পাশে সরে গিয়ে আবার সযত্নে ঘষি ফুটপাথ: দেখা যাক, এবার কী ছবি চোখে পড়ে। মা রেগে যান, আমাকে টানেন নাপিতের দোকানের দিকে, তাঁর ভয় পাছে স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যায়: কী জেদী তাঁর ছেলে।

আজ আমার ছোট মেয়ে ওক্সানাকে বলি, কীভাবে আমি বড় হয়েছিলাম, আর সে হাসে: বাবা, পৃথিবীর মাটিতে পায়ের গরম ছাপ কি শুধু বড়রাই রেখে যায়? ছোটরাও তো পৃথিবী গরম করতে জানে!

আমার মনে হয়, ঠিক কথাই বলেছে ওক্সানা: শিশুরাও পৃথিবী গরম রাখে। শিশুদের হৃদয়ের উষ্ণতা পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে দূরে মহাকাশেও পৌঁছয়। এই উষ্ণতা গ্রহ-নক্ষত্রের জগতেও আমাদের দান করে আনন্দ, আশা আর আলো।

প্রথম আবিষ্কার

আমি যেদিন প্রথম স্কুলে যাই সেদিনটির কথা কেন এত মনে পড়ে জানি না। হয়তো এই জন্যে যে সেদিন আমি হঠাৎ বুঝতে পেরেছিলাম, আমাদের চারিপাশে যাকিছু রয়েছে তার মধ্যেই আমরা দেখতে পারি অপার মাধুর্য, যাকিছুর পাশ দিয়ে বার বার যাই তার মধ্যে আবিষ্কার করতে পারি সত্য শিব ও সুন্দরকে।

সুদূরে সেপ্টেম্বরের সকালে সেই প্রথম আমার ইচ্ছে হয়েছিল ফুটপাথের ওপর আমার পায়ের উষ্ণ ছাপগুলিকে টিকিয়ে রাখি, ইচ্ছে হয়েছিল নিজের প্রথম আবিষ্কারের আনন্দে সবাইকে মাতিয়ে তুলি: দেখো, চারিদিকে সবকিছু কী সুন্দর, আজকের প্রভাতের এই মোহন রূপটির কথা তোমরা ভুলো না, তাকে তোমরা বাঁচিয়ে রাখো!

কিন্তু সৌন্দর্যকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হয় এবং কীভাবে তাকে মানুষের হাতে তুলে দিতে হয় তার কিছুই আমি তখনও জানতাম না। তাই আমি জেদ ধরে মাকে বিরক্ত করেছিলাম।

আমি আঁকতে শিখি খুবই অল্প বয়সে, স্কুলে ভর্তি হই নি তখনও। আমার আঁকা ছবি দেখে লোকে আনন্দ পেয়েছে কিনা তা আমি জানি না, আর সত্যি কথা বলতে গেলে সেকথা কখনও আমি ভাবি নি। আঁকতে আমার ভাল লাগত, — তাই আঁকতাম।

পরে শুরু হল যুদ্ধ। সোভিয়েত দেশের ঘরে ঘরে এল দুঃখদুর্দশা।

আমাদের ঘরেও এল যুদ্ধের করাল ছায়া, যদিও রণাঙ্গন ছিল সাইবেরিয়া থেকে বহু দূরে — পশ্চিমে, ভলগা নদীর কাছে। আমাদের পরিবারটি ছিল বড় — কেবল ছেলেমেয়েই ছিল নয়জন। কষ্টেসৃষ্ঠে আমাদের থাকতে হয়েছে বলে কখনও আমরা মন খারাপ করি নি, অভিযোগ জানাই নি। আমরা জানতাম, শত্রু আমাদের ঘরে যখন ঢুকেছে সে সমস্ত সোভিয়েত মানুষকে নিধন না করে ছাড়বে না, এবং এই শত্রুকে পরাস্ত করে দেশের মাটি থেকে তাড়াতেই হবে।

আমরা আরও জানতাম, দুঃখদুর্দশার বোঝা যতই ভারি হোক না কেন, মানুষের চাই আনন্দ, তাদের চাই শক্তিশালী ও উদার হৃদয়ের উষ্ণতা। এই যুদ্ধের সময়েই — যখন এমনিতেই লোকে অভাব-অনটনে দিন যাপন করছে — আমি মাকে বললাম তুলি আর রঙ কিনে দিতে। সেই উজ্জ্বল, মন-মাতানো, রহস্যময়, ঝলমলে রঙই আমার জীবনে প্রবেশ ক'রে বিশ্বলোকে আমার কাছে খুলে দিল এক নতুন সৌন্দর্য। সে রঙের ভাষা অনেক সময় মানুষের ভাষার চেয়েও ঢের জোরালো। শেষ পর্যন্ত আমি হয়তো শিল্পীই হতাম, যদি না আমাকে আকর্ষণ করত অন্য সৌন্দর্য আর অন্য রঙ — চির অপূর্ব আকাশের রঙ। এবং এই রঙের সান্নিধ্য লাভের জন্যেই আমি হলাম বৈমানিক।

বন্ধু, তুমি হয়তো প্রশ্ন করবে, কিসের জন্যে আমি তোমাকে এই সমস্তকিছু বলছি? শোনো তাহলে। ভবিষ্যতে তুমি কী হবে — মহাকাশচর, ডাক্তার, স্থপতি কিংবা বিজ্ঞানী — সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে তুমি যেন মানুষ হও। তুমি যেন মানুষকে ভালবাস, ভালবাস তোমার চারিপাশের প্রকৃতিকে। তুমি যেন শিল্পও ভালবাস। শিল্পেই সৃজনের শুরু, এ ছাড়া কোন প্রকৃত কাজই সম্ভব নয়। শিল্পের সান্নিধ্যে এসে তুমি যদি তার সম্পদকে ভালবাসতে ও বুঝতে পার তাহলে আমি খুশি হব। যে মানুষ শিল্পকে বোঝে ও তার মূল্য দেয় সে নিজেই একজন স্রষ্টা।

আমার বন্ধু ভালেরি কুবাসভ

আমার বন্ধু-মহাকাশচরদের অনেকের জীবনেই ছাপ ফেলে গেছে যুদ্ধ। ভালেরি কুবাসভের অদৃষ্ট দেখেই বোঝা যায়, কী দুর্ভোগই না সইতে হয়েছে আমাদের দেশকে, কী ক্ষিপ্র গতিতেই না সে ধাবিত হয়েছে গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে।

ভালেরির জন্ম হয় প্রাচীন রুশ শহর ভ্লাদিমিরের অনতিদূরে — ভিয়াজনিকিতে। ভিয়াজনিকি একটি ছোট্ট আঞ্চলিক শহর ও তা ক্লিয়াজ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। বসন্তে ক্লিয়াজ্মা যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে, তখন হাঁটুজলে ডুবে থাকে গাছগুলো, কুলকিনারা পড়ে না চোখে।

যুদ্ধের পরে ছোট্ট ভালেরি সমবয়সীদের সঙ্গে কাজ করে জেলের দলে, ধরত মাছ। পুরুষের সংখ্যা ছিল কম, অনেকেই যুদ্ধ থেকে ফেরে নি, তাদের জায়গা নিল শিশুরা। একার পক্ষে যে কাজ অসম্ভব মনে হয়েছে তাতে হাত দিয়েছে দু'জন।

স্কুল শেষ করে ভালেরি ভর্তি হয় মস্কোর এভিএশন ইনস্টিটিউটে। হল ইঞ্জিনিয়র।

ভালেরি যখন ইনস্টিটিউটের শেষ বর্ষের ছাত্র, আমাদের দেশ মহাকাশে প্রেরণ করে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। ব্যাস, ভালেরিকে এবার পেয়ে বসল মহাকাশের 'ব্যামো'। সে হল 'মহাকাশের কারিগর'। শুক্র গ্রহে প্রেরিত সোভিয়েত 'ভেনেরা' রকেটগুলির কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ। এত দূরের গ্রহে পৌঁছার জন্যে ক্ষমতাশালী রকেটই যথেষ্ট নয়, তার জন্যে অগাধ জ্ঞানেরও প্রয়োজন। সোভিয়েত মহাজাগতিক রকেটগুলির শুক্র গ্রহে পৌঁছতে কত দিন লাগবে এবং তার দূরত্বই বা কতটুকু — এ সমস্তকিছু যারা হিসেব করেছিল ভালেরি ছিল তাদেরই একজন।

১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে 'সয়ুজ-৬' মহাকাশযানে ভালেরি সম্পন্ন করে তার প্রথম মহাজাগতিক অভিযান। অভিযানের সময় তাকে ঝালাই কাজ করতে হয়েছিল, যা তার আগে কেউ করে নি। টমাস স্ট্যাফোর্ড তাই এখন বলে: 'ভালেরি হচ্ছে মহাকাশে ধাতু ঝালাইয়ের ব্যাপারে আমাদের বিশেষজ্ঞ'। আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা তামাসা করে: 'কোনকিছু যদি ভেঙ্গে যায়, কুবাসভ জুড়ে দেবে'। আর ভালেরি কিন্তু এখন কেবল মামুলি ঝালাই নিয়ে ভাবিত নয়। সে আসল মহাজাগতিক কারখানার স্বপ্ন দেখছে, সে স্বপ্ন দেখছে বুধ আর শুক্র গ্রহে অভিযানের। শুধু জানি না, কীভাবে সে ওখানে কাজ করবে — নিজের ছেলেমেয়েদের ছাড়া সে যে একদিনও থাকতে পারে না। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে ভালেরির একটি ছেলে হয়েছে। নাম তার মিত্কা। প্রতিটি অবসর মুহূর্তই ভালেরি তার সঙ্গে কাটাতে চায়। ভালেরিকে আমরা যখন আমাদের পাশে দেখতে পাই না, তখন আমরা বুঝতে পারি যে সে অবশ্যই ছেলের সঙ্গে রয়েছে, এবং যে-ই আমাদের জিজ্ঞেস করে: 'কুবাসভ কোথায়?' — আমরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই: 'মিত্কাকে মানুষ করছে'। এবং কখনও ভুল হয় নি আমাদের।

আমেরিকান বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের মহাকাশ অভিযানের সময় সাংবাদিকরা যখন ভালেরিকে প্রশ্ন করে, দুনিয়ার ছেলেমেয়েদের জন্যে (তার মানে তোমারও জন্যে) সে কী কামনা করতে চায়, ভালেরি উত্তরে বলে:

— সব ছেলেমেয়েদের জন্যে আমি সুখ কামনা করি, তারা যেন কখনও তাদের মা-বাপকে না হারায়।

ভানিয়া ব্রান্ডের স্ত্রী জোয়ান ভালেরির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ভালেরির মত জোয়ানেরও সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ পেশা — তিনি গৃহ-নির্মাতা। তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, মহাকাশে আমেরিকান ও রুশীদের কাজের বিষয়ে তিনি কী ভাবেন, জোয়ান বলেন:

— যুদ্ধ কী জিনিস আমার ছেলেমেয়েরা তা জানুক সেটা আমি চাই না। রুশী মহাকাশচরদের সন্তানসন্ততি প্রসঙ্গেও আমি ওই একই কথা বলব। রুশীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকাই আমেরিকানদের উচিত হবে। তা-ই মনে করে ভ্যান্স, তা-ই মনে করি আমি...

আরও দুই মহাকাশচর

হ্যাঁ, যুদ্ধ কী জিনিস তা আমাদের ভাল জানা। 'সয়ুজ' মহাকাশযানের দ্বিতীয় চালকদলের কমাণ্ডার আনাতোলি ফিলিপচেঙ্কোর স্পষ্ট মনে আছে বোমাবর্ষণের কথা। জন্ম তার ওস্ত্রগজ্স্ক শহরে। ভরোনেজ শহর থেকে ওস্ত্রগজ্স্ক প্রায় নব্বই কিলোমিটার দূরে। যুদ্ধ যখন শুরু হয় আনাতোলি তখন ছোট ছেলে। ফ্যাশিস্টরা প্রায়ই বোমা ফেলেছে ওস্ত্রগজ্স্কে, এবং হামেশাই হাসপাতালে। হাসপাতালের কাছেই আনাতোলিদের বাসা। বিমান আক্রমণের সময় তারা সবাই লুকিয়ে পড়ত ভূগর্ভ কুঠরিতে। একদিন তারা কুঠরি থেকে বেরিয়ে এসে দেখে বাড়িটি তাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং সমস্তকিছু জ্বলছে চারিপাশে। আনাতোলি যে বাড়িতে মানুষ হয়েছে ফ্যাশিস্ট বোমায় তা তখন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

'সয়ুজের' দ্বিতীয় চালকদলের বোর্ড-ইঞ্জিনিয়র নিকোলাই রুকাভিশ্নিকভও আমারই মত সাইবেরিয়ার মানুষ। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে খেলাধুলায় মত্ত, এমন সময় এক ছোকরা এসে তাকে বলে যে জার্মান ফ্যাশিস্টরা আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। সব সোভিয়েত ছেলেমেয়েদেরই মত নিকোলাইয়ের ভাগ্যেও ঘনিয়ে এল দুর্দিন। স্কুলে তারা লিখত খবরকাগজে — শাদা কাগজ ছিল না। শীতকালে — আর সাইবেরিয়ায় সে যে কী দারুণ শীত! — ক্লাশে মুখ থেকে বেরুত ভাপ। খাদ্যদ্রব্যের ছিল অভাব, তবে ছেলেমেয়েদের জন্যে খোলা হয় বিশেষ একটি ভোজনালয়। দিনে একবার করে সেখানে তাদের খেতে দেওয়া হত। নিকোলাই আজও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে পাইওনিয়র শিবিরের কথা যেখানে মা তাকে পাঠান গরম কাটাতে। ছেলেমেয়েরা সেখানে খেতে কাজ করত এবং খেয়েদেয়ে হয়ে উঠত — নিকোলাইয়েরই ভাষায় — 'নাদুস-নুদুস'।

আনাতোলি কারখানায় ঢুকে পনেরো বছর বয়সে। কারখানার প্রায় সমস্ত কর্মীই ছিল তারই সমবয়সী। মেয়েরাও ছিল। দিনরাত দশ ঘণ্টা করে তারা কাজ করত: রণাঙ্গনের জন্যে তৈরি করত মাইন, আর কৃষির জন্যে — ট্র্যাক্টর ও কম্বাইনের খুঁটিনাটি। তখন থেকেই সাধারণ শ্রমিকদের প্রতি আনাতোলির গভীর শ্রদ্ধা। পারস্পরিক সহায়তা ও ন্যায়পরতাকে সে খুবই মূল্যবান জ্ঞান করে।

১৯৪৪ সালে আনাতোলি ভর্তি হয় ভরোনেজ বায়ুসেনা বিদ্যালয়ে। যে ছেলেরা বৈমানিক হতে চায় তাদেরই জন্যে গড়া হয় এই বিশেষ বিদ্যালয়টি। বিদ্যালয়টি সবে চালু হয়েছে। জায়গায় কুলত না। পঞ্চাশজন করে থাকত একেক কামরায়। জ্বালানি কাঠেরও ছিল অভাব, ঠাণ্ডায় কালি জমে বরফ হয়ে যেত। তবে ছেলেরা পড়াশোনা চালিয়েই গেল। পড়াশোনা করল তারা চমৎকার। পরে আনাতোলি শেষ করল চুগুয়েভ কলেজ, হল সামরিক বৈমানিক।

প্রথম উড্ডয়নের কথা স্মরণ করতে আনাতোলি ভালবাসে। তা করতে গিয়ে প্রতিবারই সে খুব হাসে। জানা গেল যে প্রথমবার ওড়ার সময় বিমান চালনার হ্যাণ্ডলটি না ধরে সে শক্ত করে ধরে থাকে তার আসনটি। আসনের সঙ্গে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও তখন আনাতোলির মনে হচ্ছিল এক্ষুণি সে বিমান থেকে পড়বে ছিটকে।

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে বন্ধুদের কাছে আনাতোলি শুনল পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপের কথা। বিশ্বাস হয় নি তার। ভাবল, বন্ধুরা তামাসা করছে (মহাকাশচরদের মত বৈমানিকরাও ঠাট্টা-তামাসা ভালবাসে)। পরে দেখা গেল সবই সত্যি। আর যেদিন গাগারিন মহাকাশে গেল, নিজের ৩৩ বছর বয়সের কথা না ভেবে আনাতোলি ভর্তি হল মহাকাশচরদের দলে। ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে সে অংশ গ্রহণ করে তিন মহাকাশযানের সম্মিলিত অভিযানে।

গাগারিনের অভিযান দিয়েই নিকোলাই রুকাভিশ্নিকভেরও মহাকাশ যাত্রার শুরু। তবে মহাকাশের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে আনাতোলির আগে, — ১৯৫৭ সালে সে ছিল ডিজাইন ব্যুরোর ইঞ্জিনিয়র। ব্যুরো পরিচালনা করতেন সোভিয়েত মহাজাগতিক রকেটগুলির নির্মাতা সের্গেই করলিওভ। পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষেপণে নিকোলাই নিজেও অংশ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও কক্ষপথে উপগ্রহের প্রবেশের সংবাদ তাকে অবাক করে। নিকোলাই তখন বলে:

— আমার এমন অনুভূতি ছিল, আমি যেন অপর এক পৃথিবী দেখতে পেলাম, আমার সামনে খুলেছে কোন এক অতলস্পর্শ গহ্বর। আমার মনে হল, পৃথিবী ও আকাশকে আমি যেন নতুন চোখে দেখতে পেলাম। পৃথিবীকে যেন দেখলাম অন্য কোন জায়গা থেকে। আমি বুঝলাম, উপগ্রহটি যেখানে উড়ছে সেখানে কোন আবহাওয়া নেই, নেই দিন, নেই রাত।

পরে একদিন নিকোলাই জ্ভিওজ্দনি শহরে এসে হাজির। এসেছে সে ভিতালি সেভাস্তিয়ানভের সঙ্গে। একসঙ্গে এত মহাকাশচর দেখে নিকোলাই তো ভয় পেয়ে গেল। ভিতালিকে একপাশে নিয়ে গিয়ে ক্ষেপে বলল:

— তুই আমায় কোথায় এনেছিস? সবাই যে এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর!

আর ভিতালি হাসে:

— হলই বা, হয়তো তুইও বীর হবি।

ভিতালির ভবিষ্যদ্বাণী ফলল: ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে 'সয়ুজ-১০' মহাকাশযানে নিকোলাই সম্পন্ন করে তার মহাজাগতিক অভিযান। এই অভিযানে সে ছিল পরীক্ষাকারী ইঞ্জিনিয়র।

চরিত্রের দিক থেকে আনাতলি ও নিকোলাইয়ের মধ্যে অনেক মিল। উভয়ই ধীরস্থির, শান্তশিষ্ট ও হিতৈষী। আপন কাজে অভিজ্ঞ ও বিনয়ী লোকেদের প্রতি উভয়েরই আছে শ্রদ্ধা। এর কারণ হয়তো এই যে তারা নিজেরাই খুব বিনয়ী ও নিজেদের কাজ সম্বন্ধে তাদের রয়েছে চমৎকার জ্ঞান। নিজের সম্পর্কে নিকোলাই একবার বলেছিল:

— মহাকাশচরদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে কম বিখ্যাত।

'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযানের কর্মসূচি অনুসারে আনাতলি ফিলিপচেঙ্কো ও নিকোলাই রুকাভিশনিকভকে দেওয়া হয় 'সয়ুজ' মহাকাশযানের একটি নতুন মডেল পরীক্ষা করতে, — 'অ্যাপলোর' সঙ্গে যৌথ অভিযানে যে মহাকাশযানটির অংশগ্রহণের কথা ছিল এটি হল অবিকল তদ্রূপই একটি মহাকাশযান।

আনাতলি ও নিকোলাইয়ের এই অভিযানটি ছিল প্রাথমিক। 'অ্যাপলোর' সঙ্গে মিলিত কাজের জন্যে 'সয়ুজকে' আমরা কতটুকু প্রস্তুত করতে পেরেছি তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যেই প্রাথমিক অভিযানের প্রয়োজন দেখা দেয়। অবশ্য এই অভিযানে 'অ্যাপলো' ও তার ডকিং অ্যাসেম্ব্লির ভূমিকা পালন করেছে 'সয়ুজেরই' ডকিং অ্যাসেম্ব্লিতে যোজিত বিশেষ এক ডকিং রিঙ।

ভালেরি ও আমার যে কাজ করার কথা ছিল আনাতলি ও নিকোলাইয়ের 'সয়ুজ-১৬' মহাকাশযান তার সবকিছুই করে এল। এই অভিযানটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে — ভালেরি ও আমার মহাকাশ যাত্রার সাড়ে সাত মাস আগে। 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' অভিযান কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে আনাতলি ও নিকোলাই এই ভাবেই মহাকাশে আমাদের পথ করে দেয়। তাদের যা করতে দেওয়া হয়েছিল তার সবকিছুই তারা সম্পন্ন করেছে এবং শেষে আমাদের সঙ্গে বাইকোনুরে যেতেও রাজি হয়েছে। 'সয়ুজ-১৯' মহাকাশযানের যাত্রার সময় তারা বাইকোনুরেই ছিল এবং 'সয়ুজ-১৯'-কে কক্ষপথে পৌঁছানোর ক্ষেত্র থেকে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। আনাতলি আর নিকোলাইয়ের কণ্ঠস্বর তখন মাতৃভূমি পৃথিবীরই কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়েছে ভালেরি ও আমার কাছে। যদি কোনকিছু ঘটত — যেমন ধর, আমাদের 'সয়ুজ-১৯' কক্ষপথে 'অ্যাপলোর' অপেক্ষা করতে অক্ষম হল কিংবা কোন অপ্রত্যাশিত কারণে সে অবতরণ করতে বাধ্য হল — তাহলে কক্ষপথে আমাদের স্থান নিত আনাতলি আর নিকোলাই। 'অ্যাপলোর' সঙ্গে মিলনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বার যাতে চেষ্টা করা যায় তার জন্যে মজুত একটি 'সয়ুজ' ছিল। দরকার হলে আনাতলি ও নিকোলাই ওতে বসেই রওনা দিত।

আনাতলি ফিলিপচেঙ্কো ও নিকোলাই রুকাভিশনিকভ উভয়েই পুরোপুরিভাবে আয়ত্ত করে 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযানের কর্মসূচি, আমাদেরই মত তারাও মার্কিন মহাকাশচরদের সঙ্গে একত্রে ট্রেনিং নেয় ও বন্ধুত্ব পাতায়। 'সয়ুজ-১৬' মহাকাশযানে অভিযান সম্পন্ন ক'রে তারা 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' কর্মসূচির প্রাথমিক প্রস্তুতিতে ইতি টানে এবং যেকোন মুহূর্তে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত থাকে। এবার কাজ হল আমাদের — ভালেরি কুবাসভ আর আমার, আমাদের আমেরিকান বন্ধু টমাস স্ট্যাফোর্ড, ভ্যান্স ব্রান্ড আর ডনাল্ড স্লেইটনের। কতটুকু সাফল্যের সঙ্গে আমরা পৃথিবীর নির্দেশ পালন করতে পারব এবার তার ওপরই সবকিছু নির্ভরশীল।

অভিযানের আগে

বহু মাস ব্যাপী তালিমের পালা এবার শেষ, শেষ হল ইংরেজী শিক্ষার কাজ। 'খুঁতখুঁতে' পরীক্ষকমণ্ডলী শেষ বারের মত যাচাই করে নিলেন আমাদের জ্ঞান। সবাই আমরা সেরা নম্বর পেলাম। বিশেষ করে ভালেরির পরীক্ষা হয়েছে সবচেয়ে ভাল। খুব কড়া একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ভালেরির পরীক্ষা নিয়ে বলেন:

— সবাই উপযুক্ত নম্বর পেয়েছে, তবে কুবাসভ...: — প্রয়োজনীয় শব্দ খুঁজে না পেয়ে কিছুক্ষণ ইতস্তুতঃ ক'রে শেষে যোগ করেন: — খোলা মনে বলছি, আমি তাকে আমার পরীক্ষকের আসনটিও দিয়ে দিতে নারাজ নই।

শেষ যৌথ তালিমের জন্যে আমরা তৈরি হচ্ছি। পরস্পরের কাছ থেকে ১৬,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দু'টি চালকদলের তালিম এটি। চলবে তা একই সময়ে। ১৯৭৫ সালের ২৯শে জুন জ্ভিওজ্দনি শহরে ভালেরি আর আমি বসলাম 'সয়ুজের' তালিম-যন্ত্রে, আমেরিকানরা — 'অ্যাপলোর' তালিম-যন্ত্রে হিউস্টনে। উভয় দেশের অভিযান পরিচালনা কেন্দ্রের কর্মীরাও নিজ নিজ জায়গা নিলেন।

— 'সয়ুজ', আমি 'মস্কো'। সুপ্রভাত, — বেতারে ভেসে এল কণ্ঠস্বর। — কেমন বোধ করছ?

— 'মস্কো', 'সয়ুজ' শুনতে পাচ্ছে, — জবাব দিই আমি। — চমৎকার শুনতে পাচ্ছি তোমাদের, ভালই বোধ করছি।

শেষ তালিম — এ যেন ফাইনাল রিহার্সাল। কড়া নিয়ম অনুযায়ী আমাদের 'অভিনয় ক'রে' দেখাতে হবে অভিযানের পুরো কর্মসূচিটি, আর সোভিয়েত ও মার্কিন কেন্দ্রগুলি তখন নিজেদের পরখ করে নেবে: আমাদের অভিযান পরিচালনায় তারা কতদূর প্রস্তুত।

সোভিয়েত কেন্দ্রের পক্ষে কাজটি তেমন সহজ ছিল না — একই সঙ্গে তাকে পরিচালনা করতে হয়েছে দু'টি কর্মসূচি: 'সয়ুজ'-অ্যাপলো' অভিযানের প্রস্তুতি এবং দীর্ঘমেয়াদী কক্ষ স্টেশন 'সাল্যুত-৪'-এর উড্ডয়ন নিরীক্ষণ। 'সাল্যুত-৪'-এ তখন কাজ করছে আমাদেরই দুই বন্ধু — পিওতর ক্লিমুক আর ভিতালি সেভাস্তিয়ানভ।

২৭শে জুন থেকে মস্কো ও হিউস্টনের মধ্যে স্থাপিত হয় সরাসর টেলিফোন আর টেলিভিশন যোগাযোগ। লাল রিসিভার কানের কাছে নিলেই শোনা যায় হিউস্টন। 'সয়ুজ'-'অ্যাপলো' অভিযান শেষ না হওয়া অবধি দিনরাত কাজ করবে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা।

শোনা গেল টম স্ট্যাফোর্ডের গলা, বলছে রুশীতে, কিন্তু কথায় সেই ওকলাহোমী টান:

— মার্কিন ও সোভিয়েত মহাকাশচরেরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারে, কথা বলতে পারে মস্কো আর হিউস্টনের সঙ্গে।

মস্কো ও হিউস্টনে বসে আছেন বিশেষ 'শিক্ষকরা'। নিজেদের মধ্যে তাঁরা ঠিক করে নিয়েছেন যে পৃথিবীতে অবস্থিত কর্মিদল ও আমাদের বিরুদ্ধে তাঁরা তৈরি করবেন বিভিন্ন 'ষড়যন্ত্র'। তাঁরা চাইলেই আমাদের মহাকাশযানের কোন একটি ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে 'নষ্ট' হয়ে যেতে পারে, আর আমাদের তখন হতবুদ্ধি হলে চলবে না, তাড়াতাড়ি সবকিছু ঠিক করা চাই।

সংযোজন ঘটতে মিনিট চল্লিশেক বাকি, এমন সময় হিউস্টনের 'শিক্ষক' জানালেন যে 'সয়ুজের' ডকিং অ্যাসেমব্লির প্রস্তুতি সম্পর্কে স্বয়ংচালিত কোন সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে না। পৃথিবীতে অবস্থিত কর্মিদল তো একেবারে হতভম্ব: ব্যাপার কী, খোদ ডকিং অ্যাসেমব্লিতে গণ্ডগোল কিংবা শুধু বাল্ব জ্বলে গেছে? তাড়াতাড়ি যাচাই করা দরকার, কিন্তু কীভাবে তা করা যাবে, 'সয়ুজ' যে তখন 'চলে গেছে' বেতার দৃষ্টিগোচরতা এলাকার বাইরে? আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে মস্কো কেন্দ্র হিউস্টনের সাহায্য চাইছে, কিন্তু হিউস্টন বলে: আমাদের নিজেদেরই হাতে গাদাগাদা কাজ, 'অ্যাপলোর' কক্ষপথ নির্ধারণের প্রস্তুতি চলছে, নিজেরাই সামলান। আমাদের কেন্দ্র যদিও বোঝে যে সমস্ত কথাবার্তাই হচ্ছে খেলা, তবুও রাগ করে হিউস্টনের ওপর এবং ঠিক করে ফেলে সংযোজন আপাততঃ স্থগিত রাখবে — হিউস্টন এবার মাথা ঘামাক, ঠেলাটি বুঝুক।

আমরাই সবাইকে 'সংকটমুক্ত' করলাম: মস্কো যখন হিউস্টনের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত, পৃথিবীর 'সাহায্য' ছাড়াই ভালেরি আর আমি সমস্তকিছু যাচাই করে নিই: সংযোজন ব্যবস্থা ঠিকই আছে, আর সঙ্কেত 'উধাও হয়েছে' এই জন্যে যে স্বয়ংচালিত সংবাদ ব্যবস্থা কাজ করে নি, — এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিচার করা হয় মহাকাশযানের কলকব্জার অবস্থা।

সোভিয়েত ও মার্কিন 'শিক্ষকরা' সন্তুষ্ট — তাঁরা তো জানতেনই যে সংযোজন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিখুঁত।

যৌথ তালিম চলে তিন দিন — ২৯ ও ৩০শে জুন এবং ১লা জুলাই। বিভিন্ন জটিল প্রশ্নের সমাধান করতে হয়

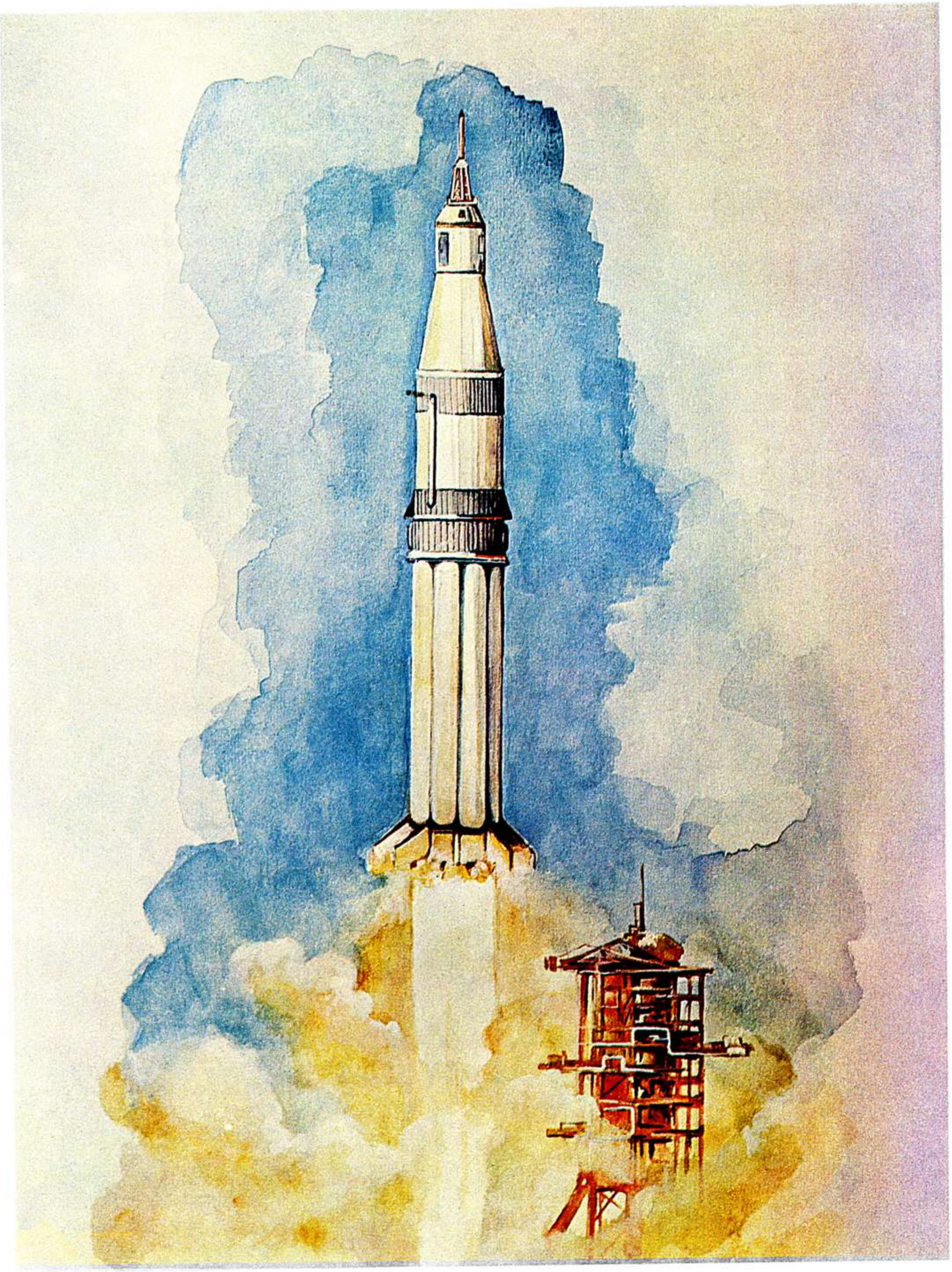

'অ্যাপলোর' বাহক-রকেট

তাতে। সময়ের দিক থেকে এই তালিম চলে ঠিক ততদিনই যতদিন আমাদের ও আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের একসঙ্গে মহাকাশে থাকার কথা — মহাকাশযান দু'টির সন্নিকটস্থ হওয়া থেকে শুরু করে তাদের বিয়োজন এবং দু'টি যৌথ বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা পর্যন্ত সবকিছুই করতে হবে এর মধ্যে।

আর এই সময় মহাকাশ ঘাঁটিগুলিতে পুরোদমে চলছে যাত্রার শেষ তোড়জোড়। কানাভেরাল অন্তরীপে 'অ্যাপলোর' ট্যাংকগুলিতে ১৬ই জুন থেকে জ্বালানি ঢালা শুরু হয়ে গেছে। 'অ্যাপলো' মহাকাশযানে এবং তাকে কক্ষপথে পৌঁছানোর রকেটে (রকেটটির নাম 'স্যাটার্ন') জ্বালানি ঢালার কাজ এখন শেষ, যাত্রার প্রাক্কালে চলছে মহাকাশযান এবং রকেটের সমস্ত ব্যবস্থার পরীক্ষা। ১লা জুলাই আমাদের বাইকোনুরেও 'সয়ুজের' ট্যাংকগুলিতে জ্বালানি ঢালা সমাপ্ত হয়।

১লা জুলাই অপরাহ্নে সমাপ্ত হয় যৌথ তালিম। তখনও হিউস্টনকে আমি বলতে পারলাম:

— 'অ্যাপলো', তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, মিলন ঘটতে বেশি দেরি নেই।

আর দশ মিনিট পরে আমি ছুটে গেলাম আমার কাজের ঘরে এবং ট্রেনিংয়ের পোশাক না ছেড়েই ফোন করলাম আমার মেয়ে ভিকা আর ওক্সানাকে, — আমার সঙ্গে পুকুরে যেতে বললাম তাদের।

— তোমরা যতক্ষণে পৌঁছবে তার আগেই আমি পাঁচ কিলোমিটার দৌড়ে নেব

খেলাধুলোর কথা মুহূর্তের জন্যেও ভোলা উচিত নয়। ডাক্তারদের কাছে দয়ামায়া নেই, লাই দিতে জানেন না তাঁরা। সোভিয়েত ও মার্কিন চিকিৎসকরা একত্রে বসে স্থির করেন যে আমাদের প্রথমে পরীক্ষা করা হবে অভিযানের ১২০ দিন আগে, আর তারপর ৪৫, ৩০, ১৫ ও ৫ দিন আগে। এই সময় ডাক্তাররা সর্বক্ষণ মহাকাশচরদের চোখে চোখে রাখেন: বিশেষ যন্ত্রে শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন করেন, তাতে শরীরের এক অংশ থেকে অন্য অংশে কৃত্রিম রক্তসঞ্চালন ঘটান, নেন হরেক রকমের অ্যানালিসিজ। এছাড়া আরও যে কতকিছু রয়েছে বলে শেষ করা যাবে না। এবং এতকিছুর পর সর্দি লাগিয়ে অভিযান থেকে বাদ পড়া? না বাপু, এর চেয়ে আমি বরং দুই কিলোমিটার বেশি দৌড়ে নেব, — ওই সর্দিটর্দি চাই না।

বাইকোনুরের পথে

১৯৭৫ সালের ২রা জুলাই মার্কিন মহাকাশচর টমাস স্ট্যাফোর্ড, ডনাল্ড স্লেইটন ও ভ্যান্স ব্রান্ড হিউস্টন থেকে রওনা দেয় কানাভেরাল অন্তরীপের কেনেডি মহাজাগতিক কেন্দ্রে। আর ৩রা জুলাই আমাদের বিদায় জানায় জ্‌ভিওজ্‌দনি।

বিচ্ছেদ মানেই পীড়াদায়ক, —এমনকি তা স্বল্পকালের জন্যেও হোক না কেন। আমাদের বিদায় জানাতে এল গোটা জ্‌ভিওজ্‌দনি শহর, অসংখ্য অতিথি। সবাই বলে 'শুভ যাত্রা, সফল কাজ'। আমি বলি:

— নো চিন্তা ডু ফুর্তি, সবকুছ ঠিক রহেগা!

বিকেল তিনটের সময় একখানা 'তু-১৩৪' বিমান আমাদের নিয়ে যাত্রা করে বাইকোনুরের পথে।

যাত্রার আগে আমরা চারজন — আনাতোলি ফিলিপচেংকো, নিকোলাই রুকাভিশনিকভ, ভালেরি কুবাসভ আর আমি যাই ক্রেমলিনে লেনিনের কাজের ঘরে। মহাকাশ ঘাঁটির উদ্দেশ্যে যাত্রার আগে অবশ্যই লেনিনের কাছে যাওয়া — এটি হল সোভিয়েত মহাকাশচরদের একটি রেওয়াজ।

এমন অন্য কোন লোকের কথা আমি শুনি নি যিনি আপন জনগণের জন্যে, সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে এতকিছু করে গেছেন। লেনিন বেঁচেছিলেন খুবই অল্পকাল, — মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫৪ বছরও হয় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর জীবন ছিল উজ্জ্বল বীরকীর্তিতে ভরপুর। সারা মানবেতিহাসেও এরূপ জীবনের সন্ধান মেলা ভার। এই মানুষটির মহত্ব, প্রতিভা ও সরলতায় বিস্মিত ও মুগ্ধ না হয়ে পারি না।

১৮৪৮ সালে 'মস্কোর প্রাদেশিক পত্রিকায়' ছোট্ট একটি সংবাদ বেরিয়েছিল: 'চন্দ্রে গমনের বিষয়ে রাজদ্রোহমূলক ভাষণ দানের জন্যে শ্রী নিকিফর নিকিতিনকে কিরগিজিয়ার বাইকোনুর গ্রামে নির্বাসিত করার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে'।

এল ১৯১৭ সাল। নতুন জীবনের ডাকে জাগ্রত হল অর্ধশিক্ষিত কাঙ্গাল দেশ। এই নতুন জীবনের পথ মানুষকে দেখিয়ে দেন লেনিন।

পুরনো পত্রিকাটি কি ভাবতে পেরেছিল যে শ'খানেক বছর পরে — বিশ্ব ইতিহাসের আয়তনে শ'বছর কিছুই নয় — কিরগিজিয়ার পাণ্ডববর্জিত নিভৃত এই বাইকোনুর গ্রাম পরিণত হবে এমন একটি স্থানে, যেখান থেকে মহাকাশে ছুটবে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ, যেখান থেকে গ্রহ-

জগতে পাড়ি জমাবে ইউরি গাগারিন, যেখান থেকে রকেট যাবে শুধু চাঁদে নয়, বুধ আর শুক্র গ্রহেও?

বাইকোনুরই যে মানুষের মহাকাশ যাত্রার প্রথম স্থান হল সেটাও লেনিনের সুকৃতি। সেটা সেই জনগণের সুকৃতি যে আজ হয়েছে নিজেরই ভাগ্যবিধাতা।

বাইকোনুর আমার কাছে বিশেষ প্রিয়। মহাকাশচরদের দলে যারা প্রথম ভর্তি হয় আমি তাদেরই একজন। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসে ফেলি, ভালবেসে ফেলি গাগারিনকে।

গাগারিন ছিল খুবই ফুর্তিবাজ লোক। এবং এত বিনয়ী যে লাজুক বলা চলে। কোন কাজ যখন তার কাছে কঠিন ঠেকত, সে ভান করত না যে তা সহজ, আর যখন তার আনন্দ হত, তখন সে ভান করত না যে এখন তার আনন্দ-ফুর্তির সময় নেই। যদি সে বুঝত যে কোথাও তার কোন ভুল হয়ে গেছে তাহলে সে তা অকপটে স্বীকার করতে পারত।

১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল — কখনও ভুলব না এই দিনটির কথা। গাগারিনের ঐতিহাসিক মহাকাশ অভিযানের চলছে কুড়ি মিনিট। মহাকাশে কেমন লাগছে, ওখান থেকে পৃথিবী কেমন দেখায়, মহাকাশযানের কলকব্জা কেমন কাজ করছে — মোট কথা মহাকাশ সম্বন্ধে মানুষের প্রথম, সবচেয়ে প্রথম ধারণা কী তা-ই জানার জন্যে প্রশ্ন করা হয় গাগারিনকে। শান্ত গলায় তাড়াতাড়ি ও সংক্ষেপে সে জবাব দিতে থাকে। রেকর্ড করা বেতারালাপটি এখনও আছে। গাগারিন বলছে: 'আমি ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা জানান'। 'পথ' বলতে সে তার কক্ষপথ বোঝাতে চেয়েছে। আমি তাকে জানাই: 'পথ তোমার ঠিকই আছে'। 'বুঝলুম — লেওনভকে শুভেচ্ছা'। তখন সকাল ৯টা ২৭ মিনিট।

মহাকাশ থেকে প্রথম যে নামটি উচ্চারিত হয় সেটি আমার, সেজন্যে আমি খুবই গর্বিত।

তারপর একদিন নিজেই আমি মহাকাশে উঠেছি। শুধু উঠিই নি, মহাকাশযান থেকে বেরিয়েওছি অকূল মহাশূন্যে। অব্যক্ত স্বাধীনতার অনুভূতি উদিত হল মনে। অতল মহাকাশের মহাসাগরে কিছুই আমার গতির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে নি।

আরও একজন লোকের নাম আমি সর্বদা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তিনি হলেন সের্গেই করলিওভ। তাঁর কথা আমি অনেক অনেকখন বলতে পারি এবং বলতে পারি হৃদয় দিয়ে। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের সারা জীবন এই লোকটির সঙ্গে জড়িত। তাঁর সঙ্গে দু'টি সাক্ষাতের কথা আমার সবচেয়ে ভাল মনে আছে। প্রথমটি — যখন আমাদের ডাকা হয় 'ভসখোদ-২' মহাকাশযানের প্রতিরূপ দেখতে। সের্গেই করলিওভ আমাকে একটি কাজ দিলেন। কাজটি হল — মহাকাশযান থেকে স্লুজে অতিক্রমণ ও প্রত্যাবর্তন। ব্যাপারটি দৈবাৎ কিনা তা আমি জানি না। কিন্তু আমার ওপর এরূপ বিশ্বাসের জন্যে আমি সুখী ও চিরকৃতজ্ঞ। মুক্ত মহাকাশে প্রথম নির্গমনের স্বপ্ন তখন আমার জীবনের সাধনায় পরিণত হল।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎও ঘটে বাইকোনুরে, পাভেল বেলিয়ায়েভ ও আমার মহাকাশ যাত্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। যাত্রার জন্যে আমরা প্রস্তুত। বিদায় জানাতে এসেছিল বহু লোক। করলিওভ ছিলেন শান্ত ও সদয়। যাত্রাকালে প্রতিটি মুহূর্তই অতি মূল্যবান। অল্প কয়েকটি কথা বলেন তিনি:

— আলেক্সেই, তুই এক কাজ কর। মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে আবার নতুন করে ঢোক। শুভ যাত্রা!

যাত্রা

রেওয়াজ মত মহাকাশযান বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় ভোর বেলা। ৪৯ মিটার দীর্ঘ আমাদের 'সয়ুজ-১৯' প্রেরণ-ক্ষেত্রে পৌঁছে ১২ই জুলাই সকাল ৭টায়।

পৃথিবীতে রকেটটি অসম্ভব সুন্দর দেখায়। তবে আমি জানি যে উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের আলোয় উড়ন্ত মহাজাগতিক রকেট আরও বেশি সুন্দর মনে হয়।

পনেরো বছর আগে যখন যাত্রার জন্যে তৈরি হচ্ছিল ইউরি গাগারিন, এখানে — বাইকোনুর মহাকাশ ঘাঁটিতে — ধ্বনিত হয়েছিল মহান ত্সিওলকভ্স্কির কথা: 'মানবজাতি চিরদিন এই পৃথিবীর মাটিতেই থাকিবে না। তবে আলো এবং মহাশূন্যের সন্ধানে প্রথমে তাহারা ভীতচিত্তে কেবল বায়ুমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইবে, আর তাহার পর জয় করিবে সৌর-সান্নিধ্য সমস্ত শূন্য দেশ'। ত্সিওলকভ্স্কির স্বপ্ন আজ সফল হচ্ছে।

বাইকোনুরে 'সয়ুজ-১৯' মহাকাশযানের যাত্রার প্রাক্কালীন প্রস্তুতি শেষ, জানা গেছে 'অ্যাপলো'ও যাত্রার জন্যে তৈরি।

— সবকিছুই ঠিক আছে, — বেতারে আমাদের বলে স্ট্যাফোর্ড।

আমেরিকায় তখন খারাপ আবহাওয়া: ঝড়-তুফান হচ্ছে খুব। বজ্রাঘাতে 'অ্যাপলোর' যাতে কোন ক্ষতি না ঘটে সেজন্যে তাকে 'লুকিয়ে ফেলা' হয় চালার নিচে।

আমাদের বাস প্রবেশ করে প্রেরণ-ক্ষেত্রে। রকেটের পাদদেশে জমেছে অসংখ্য লোক। ভালেরি আর আমি — আমরা তখন মহাজাগতিক পোশাকে সজ্জিত, তাতে মাটিতে চলাফেরায় একটু অসুবিধা হয় বৈকি, তবে মহাকাশে এ পোশাক অপরিহার্য — বাস থেকে বেরলাম। আমি ঘোষণা করলাম:

— 'সয়ুজ-১৯' মহাকাশযানের চালকদল যাত্রার জন্যে প্রস্তুত।

মহাকাশ অভিযানের সময় মহাকাশচরদের আলাদা নাম দেওয়া হয়। মহাকাশে আমার প্রথম নাম ছিল 'আলমাজ'। পরবর্তীকালেও মহাকাশচরদের সেই নামগুলি থেকে যায়। কিন্তু এবার ভালেরি আর আমার এক নাম: 'সয়ুজ'। আমেরিকানদের তা পছন্দ। আমাদের মহাকাশযানের নামও তাদের মনে ধরেছে। তারা মনে করে যে 'সয়ুজ' শব্দটিতেই নিহিত রয়েছে মহাকাশে আমাদের আসন্ন কাজের তাৎপর্যের চমৎকার ব্যাখ্যা। 'সয়ুজ' — তার মানে 'মিলন'। আমাদেরও ভাল লাগে নামটি।

লিফ্‌টে করে উঠি রকেটের চুড়োয়। তাকিয়ে দেখি, হাতছানি দিয়ে সবাই বিদায় জানাচ্ছে।

মহাকাশযানে নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে বসলাম। বিপরীত গতিতে ছুটতে থাকে সময়।

চাঙ্গা মেজাজ, উল্লসিত প্রাণ। কথাবার্তা চলছে, আজ প্রতিটি ছেলেমেয়ের পরিচিত সেই আসল কথাগুলির অপেক্ষায় আমরা:

— রেডি!

— এক!

— দুই!

মহাকাশযানের ভেতরে পূর্ণ শৃঙ্খলা।

সরে পড়ে শেষ ক্যাবল-মাস্তুলটি যা রকেটকে মাটির ওপর ধরে রাখে। শোনা যায়:

— ফায়ার!

— আপ্!

ঘড়ি দেখলাম। মস্কো সময় বিকেল ৩টে ২০ মিনিট। প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবী খবর দিচ্ছে উড্ডয়ন কেমন চলছে। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। বাড়ছে চাপ। মহাকাশযানের গতিও পাচ্ছে বৃদ্ধি। তারপর আমরা চলে গেলাম ভূ-মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে।

মহাকাশে পৌঁছার পর ওজন আর থাকল না। এবার শুরু হল ওজনহীনতা। টমাস স্ট্যাফোর্ড আমাদের বলে:

— শিগগিরই আমরা তোমাদের নাগাল ধরব!..

কিন্তু টেলি-কমেন্টেটর টমাসকে থামিয়ে দেন:

— সবুর করো, অত শিগগির আর হচ্ছে না, তোমাদের আরও দু'দিন উড়তে হবে।

রাত ১০টা ৫০ মিনিটের সময় কানাভেরাল অন্তরীপ থেকে মহাকাশে যাত্রা শুরু করে 'অ্যাপলো'।

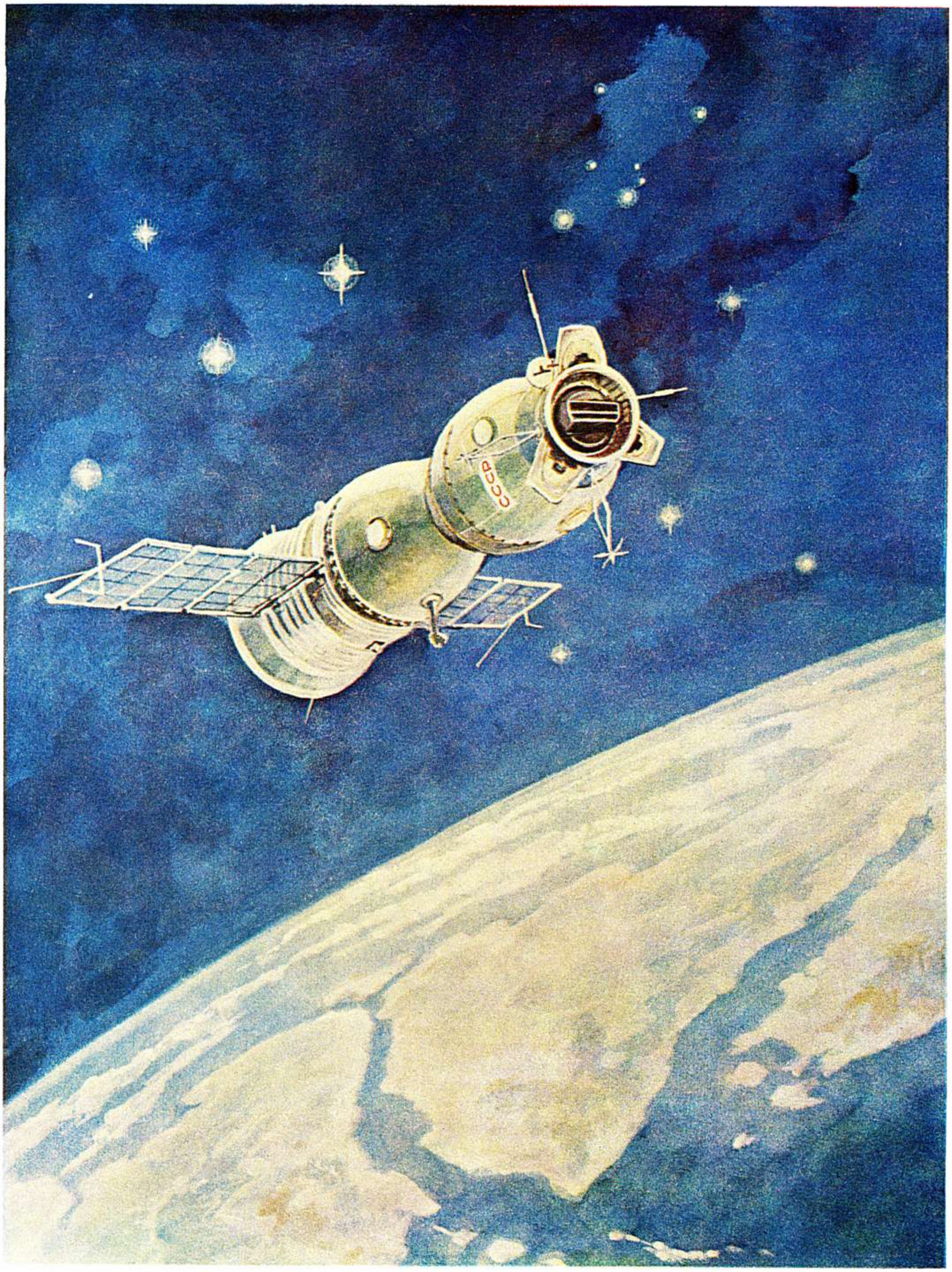

মহাকাশে 'সয়ুজ'

কাজের শ্রুরু

কাজ হল শ্রুরু। এই কাজের জন্যে আমরা তৈরি হয়েছি দ্রু' বছরেরও বেশি। সারা দ্রুনিয়া অধীর হয়ে করেছে তার অপেক্ষা। প্রায় প্রুর্ব-নির্ধারিত কক্ষেই প্রবেশ করে 'সয়্রুজ-১৯'। মহাকাশযানের প্রথম প্রদক্ষিণগ্রুলি সম্পন্ন হয় চক্রাকারে নয়, তা সম্পন্ন হয় উপবৃত্তাকারে এবং অন্রুভূ ও ও অপভূতে তার দ্রুরত্ব থাকে যথাক্রমে ১৮৬ ও ২২১ কিলোমিটার। 'অ্যাপলো' যখন মহাকাশে প্রবেশ করে তখন আমাদের মধ্যে দ্রুরত্ব প্রায় ছয় হাজার কিলোমিটার। 'সয়্রুজ' উড়ছে আগে আগে, 'অ্যাপলো' এগ্রুচ্ছে অপেক্ষাকৃত নিম্ন কক্ষে। তার গতি আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ও ধীরে ধীরে সে আমাদের নাগাল ধরছে।

চতুর্থ প্রদক্ষিণে আমরা পরিচালনা করি কক্ষপথ গঠনের প্রথম মহড়া, — এই কক্ষেই 'অ্যাপলোর' সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের কথা। এই উদ্দেশ্যে আমি মহাকাশযানের গতি বাড়িয়ে দিলাম, ফলে দৃশ্য-গ্রহণ যন্ত্রের পর্দায় পৃথিবী ছ্রুটতে লাগল ০-১৮০° ডিগ্রি অবস্থান নিয়ে। ভালেরি তখন কাজের জন্যে প্রস্তুত করে রাখছে মহাকাশযানের স্বয়ংচালিত যন্ত্রটি। নির্ধারিত সময়ে আমরা তা চাল্রু করলাম, এবং মহাকাশযান উড়তে লাগল স্বয়ং-চল বিমানের মত। তারপর ঠিক নির্ধারিত সময়ে আমি মোটরটি চাল্রু করলাম। মহাকাশযানটি ভেসে উঠল, সৃষ্টি হল সামান্য চাপ, ঠিক এক সেকেন্ড পরে আমি মোটর বন্ধ করে দিলাম। কক্ষপথ গঠন — কাজটি গ্রুর্রুত্বপ্রুর্ণ এবং দায়িত্বও তাতে অনেক। পৃথিবীতে থাকতেই তার হিসেব-নিকেশ করে ফেলতে হয়। একটু উনিশ-বিশ হলেই ম্রুশকিল।

মনে করো, মহাকাশযানকে কক্ষপথে পৌঁছানোর সময় তার নির্ধারিত গতি সামান্য বেড়ে গেল — ধরো, সেকন্ডে মাত্র এক মিটার। বলবে, ও এমন কিছ্রু নয়, মাম্রুলি ব্যাপার। কিন্তু এই 'মাম্রুলি ব্যাপারই' কক্ষপথের বিপরীত বিন্দ্রুতে সাড়ে তিন কিলোমিটারের বিচ্যুতি ঘটাবে। তাছাড়া, একেক প্রদক্ষিণে মহাকাশযানের এবার খরচ হবে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে 'মাত্র' দ্রুই সেকন্ড বেশি, এবং মহাকাশে মহাকাশযানের অবস্থানেও দেখা দেবে পার্থক্য — নির্ধারিত দ্রুরত্বের চেয়ে ১৫ কিলোমিটার অতিরিক্ত। যত দীর্ঘকাল মহাকাশযান থাকবে মহাকাশে, বিচ্যুতি ততই বাড়বে, শেষ পর্যন্ত ফল হবে সম্প্রুর্ণ বিপরীত: মহাকাশযানগ্রুলির মিলন তো ঘটবেই না, বরং তারা পরস্পরকেই হারিয়ে ফেলবে।

তুমি ব্রুঝতেই পারছ, একজনের পক্ষে এতকিছ্রু সামলানো মোটেই সহজ নয়। তাই মান্রুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে চটপটে ব্রুদ্ধিমান সব গণন-যন্ত্র (কম্পিউটার)। কিন্তু মহাকাশযান চালাতে হয় মান্রুষকেই, যন্ত্র শ্রুধ্রু তাকে বলে দেয় কীভাবে কাজ করলে ভাল হবে। এই জন্যেই আধ্রুনিক মহাকাশচরের থাকা চাই গণিতে চমৎকার জ্ঞান এবং অনতিবিলম্বে তাকে করতে পারা চাই জটিলতম সমস্যার সমাধান, — নতুবা মহাকাশে শিগগিরই সে 'পথহারা' হয়ে পড়বে।

প্রথমবার কক্ষ নির্ধারণের পর ফের আমরা তার মহড়া দিলাম সপ্তদশ প্রদক্ষিণের সময় যাতে চ্রুড়ান্তভাবে গঠন করা যায় সাংযোজনিক কক্ষপথ। এবার আমাদের মহাকাশযান চলতে থাকে উপবৃত্তাকারে নয়, চক্রাকারে, এবং পৃথিবী থেকে সেই চক্রের দ্রুরত্ব ২২৫ কিলোমিটার। আমাদের 'সয়্রুজকে' দৃষ্টির বহির্ভূত হতে না দেওয়ার জন্যে 'অ্যাপলোর' চালকদলও তাদের প্রথম মহড়া পরিচালনা করল।

মহাকাশে 'অ্যাপলো'

মহাকাশে মহড়ার সময় সোভিয়েত ও মার্কিন মহাকাশচরদের অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও করতে হয়। ১৫ জুলাই তারিখেই ভালেরি আর আমি শুরু করে দিই জীববৈজ্ঞানিক গবেষণাদি, — বিভিন্ন বীজ এবং দানিও রেরিও নামক মাছের পোনা নিয়ে গবেষণাও ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। 'সয়ুজ-১৬' মহাকাশযানে আগেই অনুরূপ গবেষণা কার্য পরিচালনা করে আমাদের বন্ধু আনাতলি ফিলিপচেঙ্কো ও নিকোলাই রুকাভিশনিকভ, তাই এখন আমাদের আসল কাজ হল তাদের প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে আমাদের ফলাফল তুলনা করে দেখা।

এসো, এবার ওজনহীনতা সম্বন্ধে দু'-একটা কথা বলি। তুমি নিশ্চয়ই জান যে মহাকাশে কোন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নেই, — মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে পৃথিবীতে। তাই মহাকাশযানের ভেতরে আমরা চলি না, সাঁতার দিই। ওজনহীনতা বা ভারহীনতায় মানুষ বেশ তাড়াতাড়িই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে, এবং আগে থেকে ভাল তালিম নিয়ে থাকলে এরূপ অবস্থায় বেশ ভালই লাগে। ওপর-নিচ কী জিনিস তা আর তখন অনুভূত হয় না। তবে ওজনহীনতা কেবল আরামদায়কই নয়, তা খুব উপকারীও। প্রথম মহাজাগতিক ঝালাই কাজ সম্পন্ন ক'রে ভালেরি কুবাসভ বৈজ্ঞানিক মহলে এমন ধারণা সৃষ্টি করল যে মহাকাশে ধাতু গলিয়ে তার সম্পূর্ণ নতুন সব গুণ মিলতে পারে যা পৃথিবীতে কোন মতেই সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' কর্মসূচিতেও একটি গবেষণা অন্তর্ভুক্ত হয়। গবেষণাটির নাম — 'বহুমুখী চুল্লী'। তখন আমাদের সামনে পরীক্ষামূলক কাজ —১,১০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড অবধি উত্তপ্ত মহাজাগতিক গালাই চুল্লীতে কী কী নতুন — ধাতব ও অর্ধ পরিবাহী — দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে।

মহাকাশ অভিযানের সেই প্রথম বছরগুলিতে সের্গেই করলিওভ বলেছিলেন: 'গোটা মানবজাতি আমার কাছে অনেকটা ক্ষ্যাপা বলে মনে হয়। আগুন পোয়ানোর জন্যে সে নিজের বাড়ির দেয়াল ভেঙ্গে চেলা বানায়, কাঠের জন্যে বনে যেতে পারে না'।

তুমি জিজ্ঞেস করবে, নতুন দ্রব্যে মানুষের কী প্রয়োজন? তোমার অতি পরিচিত ইস্পাতের কথাই ধরা যাক। ভীষণ শক্ত এই ধাতুর একটি টুকরো জলে ফেলতে না ফেলতেই চলে যায় একেবারে তলায়। তা ঘটে এই কারণে যে ইস্পাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব জলের আপেক্ষিক গুরুত্বের তুলনায়

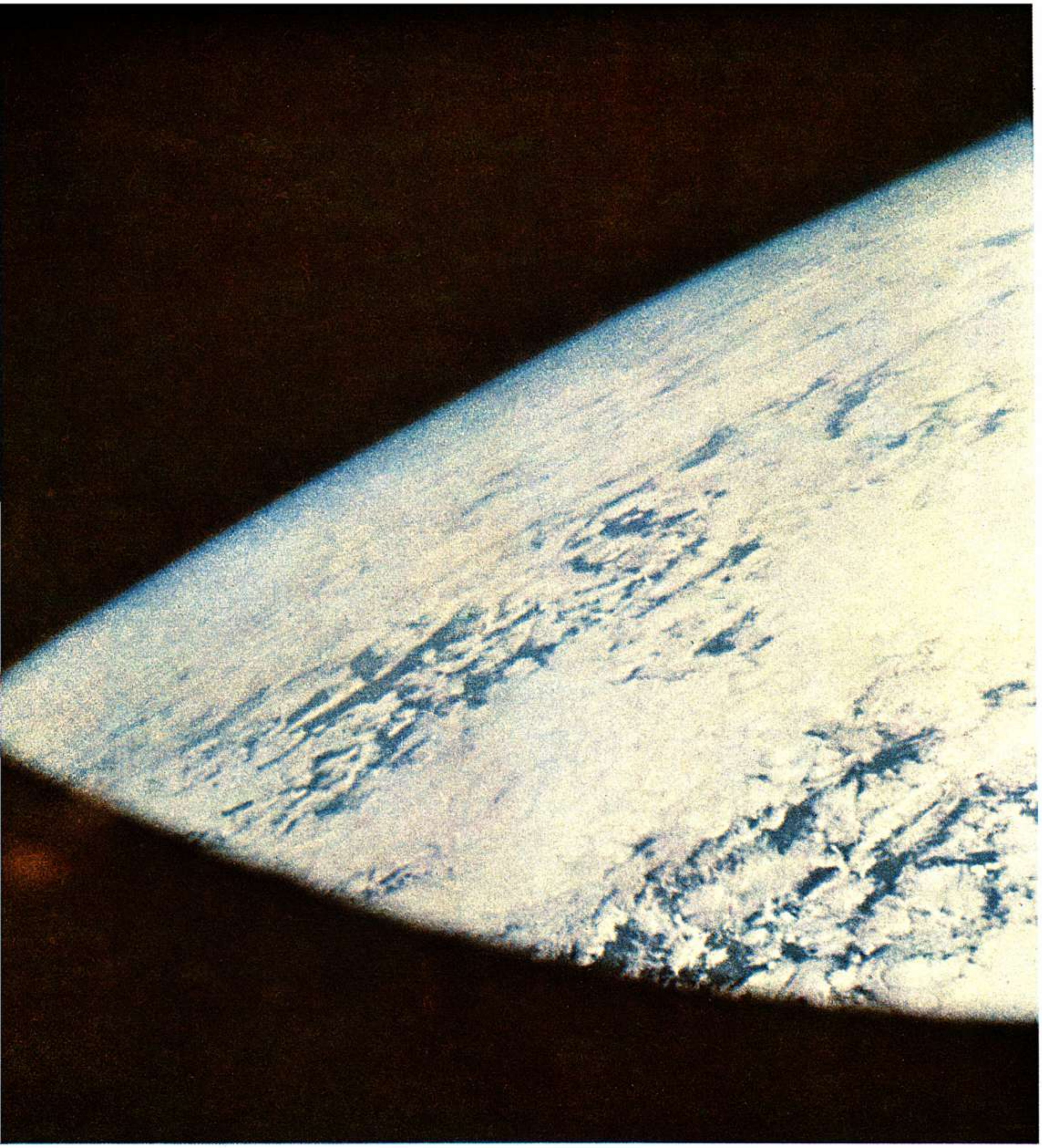

মহাকাশ থেকে পৃথিবী এমনি দেখায়

বহুগুণ বেশি। কিন্তু মহাকাশে ব্যাপার আলাদা। দেখা গেল, ওখানে পাওয়া যায় সাধারণ নয়, সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের ইস্পাত যা দেখতে ফেনার মত। তাই তার নাম হয় — ফেনোস্পাত। নতুন এই দ্রব্যটিতে আছে ৯০ শতাংশ গ্যাস আর ১০ শতাংশ সাধারণ ইস্পাত। ফেনোস্পাত জলে ডুবে যাবে না, ভাসবে, এবং সাধারণ ইস্পাতেরই মত হবে মজবুত। নতুন নমুনার বিমান, গাড়ি ও মহাকাশযান গড়তে ফেনোস্পাত অবশ্যই মানুষের খুব কাজে লাগবে। তাছাড়া মহাকাশে পাওয়া যায় (অপটিক্যাল যন্ত্রপাতির জন্যে) অতি বিশুদ্ধ কাঁচ এবং আরও বহুকিছু।

এক কথায় বন্ধু, মহাকাশে কাজ আছে মেলা। তাই অদূর ভবিষ্যতে মহাকাশচরদের রপ্ত করতে হবে নতুন নতুন পেশা, — যেমন, ইঞ্জিনিয়র, কারিগর ও মহাজাগতিক শ্রমিকের পেশা। সেই জন্যেই তো মহাকাশে নতুন দ্রব্যাদি প্রস্তুতির সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের দেশে ও আমেরিকায় আজ চলছে বিস্তর গবেষণা। ১৯২৮ সালে কনস্তান্তিন ত্সিওলকভ্স্কিই লিখেছিলেন: 'মহাশূন্যেও মানুষ ধীরে ধীরে বাসা বাঁধিবে। তাহারা সূর্যকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিবে। মানুষের সম্পদও লক্ষ কোটি গুণ বৃদ্ধি পাইবে'।

অভাবিত ঘটনা

প্রায় প্রতিটি মহাকাশ অভিযানেই কোন-না-কোন অভাবিত ঘটনা ঘটে। এবারও তাই ঘটল। অভিযানের প্রথম দিনই আমাদের 'সয়ুজে' 'অন্ধ হয়ে গেল' টেলিভিশন যন্ত্রপাতি, আর আমেরিকানদের 'অ্যাপলোয়' 'জেদ ধরল' ট্রাঞ্জিশনেল স্লুজের একটি হ্যাচ-ওয়ে। অন্যান্য অপ্রত্যাশিত ব্যাপারও বাদ যায় নি। ফলে ভালেরি ও আমাকে এবং আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের ১৫ জুলাই সারা রাতই ঘুমের বদলে কাজ করতে হয়েছে।

পৃথিবীতে — অভিযান পরিচালনার সোভিয়েত ও মার্কিন কেন্দ্রগুলিতে — বিশেষজ্ঞরা তাড়াহুড়ো করে খুঁজতে লাগলেন 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলোয়' গোলযোগের কারণ। মহাকাশযানের অভ্যন্তরস্থ টেলিভিশন ব্যবস্থায় যে গণ্ডগোল ছিল তা সঙ্গে সঙ্গেই ধরা পড়ল। তবে তা সারাতে হাঙ্গাম হয়েছে বেশ। সহকারী দলের কমাণ্ডার ভ্লাদিমির জানিবেকভ প্রথমে পুরো কাজটি পৃথিবীতে সম্পন্ন করে, তারপর মহাকাশে আমাদের দেয় তার নির্দেশ। মহাকাশযানের ভেতরে তিন-তিনবার চলে মেরামত। ১৫ই জুলাই বিকাল থেকে শুরু করে সারা রাত ও ১৬ই জুলাই সারা দিন মেরামতি চলতে থাকে। ১৬ই জুলাই কেবল সন্ধ্যায় আমরা আবির্ভূত হলাম পৃথিবীর ঘরে ঘরে — টেলিভিশনের পর্দায়। কোটি কোটি লোক আমাদের দেখেছে সে সন্ধ্যায়। পরে সবাই আমাদের বলেছে আমরা নাকি খুশিতে হাসছিলাম।

আমরা সত্যিই আনন্দিত হয়েছিলাম: পৃথিবীতে ভ্লাদিমির জানিবেকভ যে ইনসুলেটিং টেইপ ব্যবহার করে তা আমাদের কাছে ছিল না। তার বদলে আমরা ব্যবহার করি লেইকোপ্ল্যাস্টার। এবং মন্দ হয় নি, ক্যামেরাগুলি চমৎকার কাজ করল।

আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা জেদী হ্যাচ-ওয়েটি নিয়ে বেশ ঘাঁটাঘাঁটির পর শুয়ে পড়ল। আর হিউস্টনের বিশেষজ্ঞরা তখন গোলযোগের কারণ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কারণটি শিগগিরই জানা গেল। ঘুম থেকে উঠে মহাকাশচরেরা নবোদ্যমে কাজে লাগল। পৃথিবীর সঙ্গে চলল পরামর্শ: কোন্ ঢাকনাটি খুলতে হবে, কোন্ কোন্ স্ক্রু-নাট খুলে কোনগুলি আঁটতে হবে ইত্যাদি সব কথাবার্তা। ব্যস, আধঘণ্টা পর সব কাজ শেষ। হ্যাচ-ওয়ে খুলে গেল।

— ও'কে! — মার্কিন মহাকাশচররা খবর দেয় পৃথিবীকে। — এবার সবকিছু বিলকুল ঠিক।

মহাকাশচরদের রসিকতা বোধ

পৃথিবীতে সবাই উদ্বিগ্ন: 'অ্যাপলোর' ভেতরে টমাস স্ট্যাফোর্ড এক টিকিটবিহীন যাত্রীকে ধরেছে! এই যাত্রীটি কে জান? যাত্রীটি হল ফ্লোরিডার একটি বড় মশা। যাত্রার আগে মহাকাশযানের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং মহাকাশচরদের সঙ্গে উড়ছে।

টমাসের পাঠানো এই খবর শুনে সবাই হেসে উঠল।

আমাকে বলা হল যে জেদী হ্যাচ-ওয়েটি নিয়ে এত পরিশ্রমের পর মার্কিন অভিযান পরিচালনা কেন্দ্রে আমার তামাসাটি খুব কাজে লেগেছিল, এমনকি পরিশ্রমের কথাটিই সবাই ভুলে গেল। তামাসাটি হল — পরিচালনা কক্ষে নিরীক্ষণ যন্ত্রের পর্দায় নীরস সব সংখ্যার পরিবর্তে হঠাৎ ভেসে উঠল আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের ব্যঙ্গচিত্র। আমিই এঁকেছিলাম ওগুলো।

একবিংশতিতম প্রদক্ষিণে আমাদের অপেক্ষায় ছিল নতুন এক চমকপ্রদ ঘটনা: পিওতর ক্লিমুক ও ভিতালি সেভাস্তিয়ানভের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হল ভালেরি আর আমাকে। 'সালুৎ-4' স্টেশনের চালকদল 'ছুটি ছাড়া' মহাকাশে কাজ করছে প্রায় দুই মাস, এবং তাদের জন্যে আমাদের সবারই ভীষণ মন টানছে।

— কক্ষে পৌঁছা উপলক্ষে তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি! — 'সালুৎ-4' থেকে আমাদের জন্যে আসে অভিনন্দন বাণী।

— ধন্যবাদ, মহাকাশের দীর্ঘ-বাসিন্দাদেরও আমরা অভিনন্দিত করছি।

বাইকোনুরের পথে রওনা দেওয়ার কিছুদিন আগে জ্ভিওজ্দনিতে মিশার সঙ্গে আমার দেখা হয়। মিশা — ক্লিমুকের ছেলে। সে আমাকে অনুরোধ করেছে আমি যেন তার বাবাকে বলি যে বাবার জন্যে তার মন টানছে। অনেক শুভেচ্ছা জানাতেও বলেছে। ক্লিমুককে আমি অবশ্য মিশার কথা জানালাম, তবে মনে মনে ভাবলাম: প্রায় দু'মাস হতে চলল পিওতর আর ভিতালি মহাকাশে রয়েছে, কিন্তু পৃথিবীর চারিদিকে কক্ষপথে যখন গড়ে উঠবে নতুন-নতুন বড়-বড় স্টেশন আর কারখানা তখন মানুষকে কতদিন উড়তে হবে একনাগাড়ে? ছ'মাস, বছর, দুই বছর?

ভবিষ্যতে এমনকি দুই বছরেরও অধিক কাল মানুষকে মহাকাশে কাজ করতে হবে (যেমন, বুধ ও শুক্র গ্রহে গবেষণামূলক অভিযানের সময়)। কিন্তু তখন মহাকাশচরদের ছেলেমেয়েদের অবস্থাটা কেমন হতে পারে, একবার কল্পনা করে দেখো দিকি! এমনিতেই দু'তিন দিন বাপকে ছেড়ে থাকলে তাদের কী মন খারাপ হয়!

আমি তখন ভাবলাম: ভবিষ্যৎ মহাজাগতিক স্টেশন আর কারখানাগুলির পরিকল্পক ও নির্মাতাদের একটা বুদ্ধিও তো দেওয়া যেতে পারে: নির্মাণের সময় তারা যেন কিণ্ডারগার্টেন আর স্কুলের কথাও ভাবে। কী বলো? মনে হয়, ছেলেমেয়েরা সবাই আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করবে, এবং মহাকাশচরদের ছেলেমেয়েরাই শুধু নয়। মা-বাবাদের সঙ্গে বছর দুয়েক মহাকাশে থাকতে কে-ই বা না চাইবে, খোলা মহাকাশে ঘুরে বেড়াতে এবং পৃথিবী ও গ্রহ-নক্ষত্র দেখে মুগ্ধ হতে কারই বা ইচ্ছে নেই? আর আমরা মা-বাপেরাও তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারব: ছেলেমেয়েরা তো কাছেই রয়েছে।

আমার সব কথা শুনে আমাকে ধন্যবাদ জানাল ক্লিমুক। বলল:

— তোমাদের ওপর সব সময়ই আমাদের নজর রয়েছে। মাঝেমধ্যে কেন্দ্রের সঙ্গে তোমাদের বেতারালাপ শুনতে পাই। পাছে কাজে বাধা হয় তাই কিছু বলি না। কাজটি তোমাদের দায়িত্বপূর্ণ।

আমরা অনেকখন কথা বলি। অনেকদিন দেখা হয় নি তো! 'সালুৎ' উড়ছে 'সয়ুজের' ওপরে ও আগে আগে, তাই নিরীক্ষণ-কেন্দ্র আমাদের সুদীর্ঘ আলাপের সুযোগ দিতে পেরেছিল। পিওতর ও ভিতালি খুশি যে আমাদের মহাকাশযানের টেলি-ক্যামেরাগুলি কাজ করতে শুরু করেছে এবং পৃথিবী আমাদের দেখতে পাচ্ছে।

— তোমাদের ওখানে কোনকিছু মেরামতির দরকার হলে বলো, আমরা প্রস্তুত! — বললাম আমি।

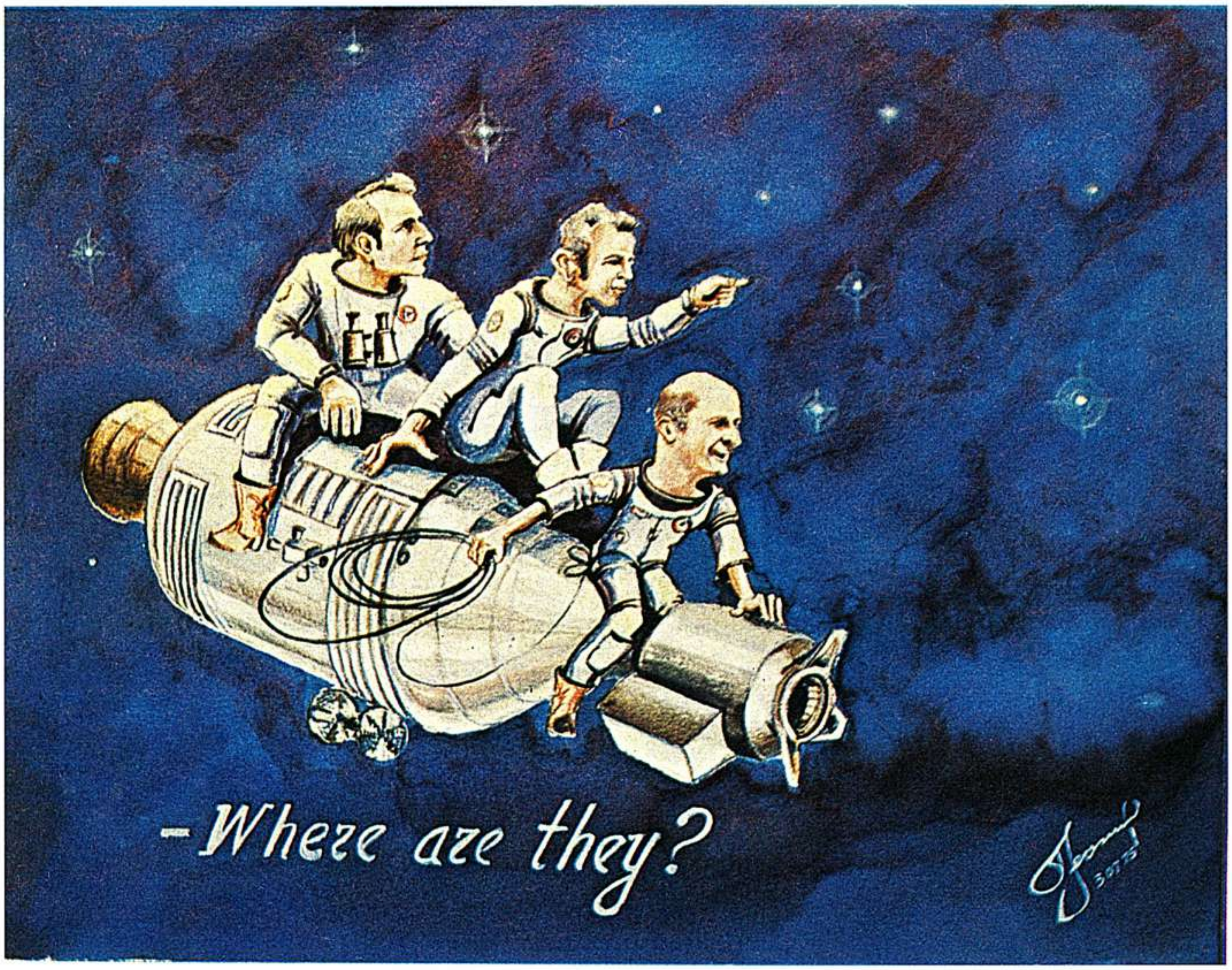

মিলনের আগে

১৯৭৫ সালের ১৭ই জ্বলাই ১২টার দিকে (মস্কো সময়) আমাদের 'সয়ুজ' পৃথিবীর চারিদিকে তিরিশটি প্রদক্ষিণ সম্পন্ন করে, তার মধ্যে তেরোটিই সাংযোজনিক কক্ষে। হিসেব থেকে বিচ্যুতির পরিমাণ ছিল মাত্র ২৫০ মিটার — যেখানে সর্বাধিক পরিমাণ হতে পারে দেড় কিলোমিটার, আর কক্ষের নির্ধারিত বিন্দুতে মহাকাশযানের আগমন সময়ের বিচ্যুতির পরিমাণ ছিল সাড়ে সাত সেকেন্ড — যেখানে সর্বাধিক পরিমাণ হতে পারে দেড় মিনিট।

মার্কিন মহাকাশচরেরা কক্ষপথে পরিচালনা করল নাক্ষত্রিক পর্যবেক্ষণ এবং বহুমুখী বৈদ্যুতিক চুল্লীতে — বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

সংযোজনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এল।

আমার অনুরোধে মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা 'অ্যাপলোর' ডকিং অ্যাসেমব্লিতে একটি নিশানা তৈরি করেন যাতে সন্নিকটস্থ হওয়ার সময় কাজ করতে সুবিধা হয়। বিমানের পাখার মত দেখতে খোলা সৌর ব্যাটারিগুলির সঙ্গে আমাদের 'সয়ুজে' কাজ করেছে আলোক সংকেত, আর 'অ্যাপলোর' কাছাকাছি হওয়ার সময় আমরা জেবলে দিই পার্শ্ববর্তী স্থিতি নির্ণায়ক আলোগুলি। আলোক সংকেতগুলির সাহায্যে কয়েক শো' কিলোমিটার দূর থেকে মার্কিন বন্ধুরা আমাদের দেখতে পেয়েছে।

মহাকাশে ক্ষুদ্র দুই কণিকার সন্ধানে ও মিলনে উভয় চালকদলই সমান অংশ নেয়। 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলোর' সন্ধানে ও মিলনে অপ্রত্যাশিত বাধাবিপত্তি এড়ানোর উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আগে থেকেই তৈরি ছিল এক বিশদ কর্মসূচি। যেমন ধরো, খারাপ আবহাওয়ার দরুন

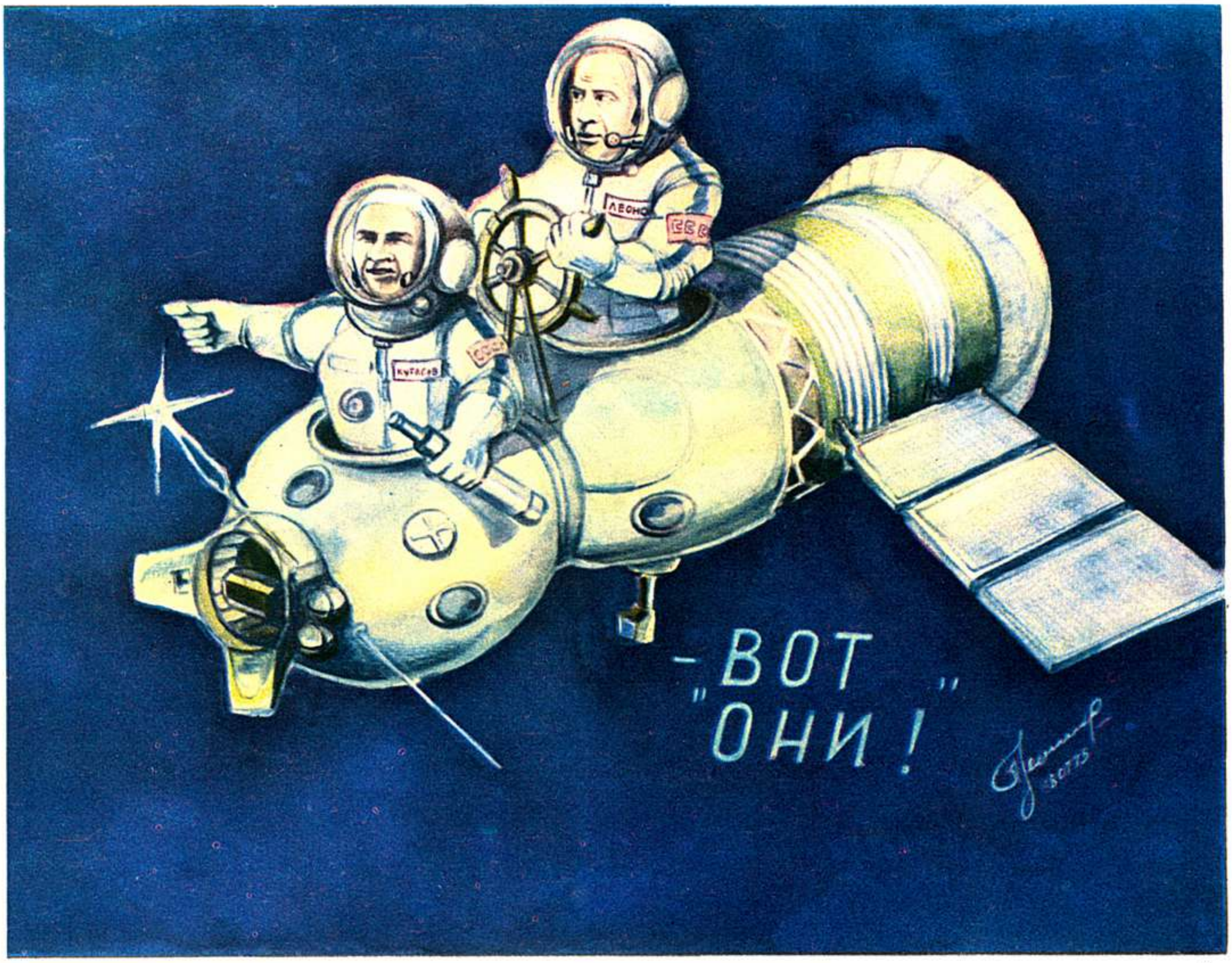

বন্ধুর ব্যঙ্গচিত্র

'অ্যাপলো' উড়তে পারল না, তখন এই কর্মসূচি অনুযায়ী কক্ষপথে 'সয়ুজ' তার জন্যে অপেক্ষা করবে অতিরিক্ত সময়, — দরকার হলে এমনকি চারদিনও তার অপেক্ষায় থাকতে হবে। যেমন, কোন একটি মহাকাশযানে সংযোজন ব্যবস্থাটি বিকল হয়ে পড়ল কিংবা স্থিতি নির্ণায়ক আলোগুলি গেল নিভে। এমতাবস্থায় কী করা দরকার তারও উল্লেখ ছিল কর্মসূচিতে। বেতারযন্ত্রে গোলযোগ দেখা দিলে এবং... আগুন লাগলে চালকদলকে কী করতে হবে এমনকি সে সম্বন্ধেও নির্দেশাদির অভাব ছিল না। দেখলে তো তাহলে, অভিযান কর্মসূচিতে আগে থেকেই কতকিছু বিবেচনা করে রাখা হয়, — এমনকি একেবারে 'মামুলি' ব্যাপার-স্যাপারও।

১৭ই জুলাই সকাল সোয়া দশটায় (মস্কো সময় অনুসারে) পৃথিবীর সঙ্গে শুরু হয় আমাদের প্রথম বেতার যোগাযোগ।

'সয়ুজ', আমি 'মস্কো' বলছি, — ভেসে এল ভ্লাদিমির জানিবেকভের কণ্ঠস্বর। — সুপ্রভাত, কেমন বোধ করছ, ঘুম কেমন হল?

— চমৎকার বোধ করছি, — উত্তর দিই আমরা। — 'অ্যাপলোর' খবর কী?

— সবকিছুই ঠিক আছে, ওরা এখনও বিশ্রাম নিচ্ছে।

'সয়ুজের' ভেতরে চাপ কমিয়ে অক্সিজেনের পরিমাণ দেওয়া হল বাড়িয়ে। এক মহাকাশযান থেকে অপর মহাকাশযানে যাওয়ার জন্যে আমরা প্রস্তুত।

পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে ইচ্ছুক দু'টি ভিন্ন দেশের দুই মহাকাশযানের মহাশূন্যে প্রথম মিলনের দিন সেটি। মানবেতিহাসে তা একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন পেট ভরে আমরা সকালের খাবার খেয়েছি: সামনে দায়িত্বপূর্ণ কাজ। হঠাৎ দেখি আমার হাত থেকে জ্যাম 'সাঁতরে' চলে যাচ্ছে। জানি না কেন তা হল — মহাকাশযানে

চাপ কমে যাওয়ায় কিংবা অন্য কোন কারণে। আমরা হেসে মরি! গা থেকে জ্যাম পরিষ্কার করতে করতে শুনি যে সংযোজনের প্রাক্কালে আমাদের আমেরিকান বন্ধুরাও 'ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজে' ব্যস্ত: স্ট্র-বেরির পেকেট খোলার সময় ভ্যান্স ব্রান্ড নাকি সব ফল 'অ্যাপলোতে' 'ছড়িয়ে' দিয়েছে এবং সবাই মিলে এখন ওগুলো ধরছে।

— আমাদের সারা মহাকাশযান স্ট্র-বেরির রঙে লাল! — বলে 'অ্যাপলো'।

— এখন তার কেমন গন্ধ? — জানতে চায় হিউস্টন।

স্ট্র-বেরির কিছুটা তারা ধরে ফেলে আর কিছুটা খেয়ে নেয়।

৩৪তম প্রদক্ষিণে 'অ্যাপলোর' সঙ্গে আমরা স্থাপন করি সরাসরি বেতার যোগাযোগ — আমাদের মহাকাশযানগুলি তখন অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে এবং আমাদের মধ্যেকার দূরত্ব মাত্র ৪৩০ কিলোমিটার।

— 'সয়ুজ!' — কানে এল টম স্ট্যাফোর্ডের কণ্ঠস্বর। বলছে রুশীতে। — সুপ্রভাত, আমাকে কেমন শুনতে পাচ্ছ?

— ভালই শুনাচ্ছে, তোমরা ভাল তো? — বলি আমি ইংরেজীতে।

মহাকাশযান দু'টি পরস্পরের দিকে ভালই এগুচ্ছে। আমরা চলেছি ঠিক সাংযোজনিক কক্ষে। 'অ্যাপলো' এখনও চলছে আমাদের চেয়ে নিচে। 'সয়ুজকে' আমি ঘোরালাম অনুদৈর্ঘ্য অক্ষদণ্ডের ওপর ষাট ডিগ্রির অবস্থানে: সংযোজনের সময় 'অ্যাপলোর' অ্যারিয়েলগুলিকে মুখ করে থাকতে হবে কেনিয়ার ওপর 'ঝুলন্ত' যোগাযোগ সাধনকারী মার্কিন স্পুৎনিকটির দিকে, আর তারপর সেই স্পুৎনিক মাধ্যমে বেতার ও টেলিভিশন সংবাদ পেঁছিবে পৃথিবীতে।

আর পৃথিবী তখন চঞ্চল। মস্কোর সঙ্গে ভালেরির এবার পাকা যোগাযোগ। আমি পুরোপুরিভাবেই কাজ করছি 'অ্যাপলো' আর হিউস্টনের সঙ্গে। কাজ চলছে ইংরেজীতে।

—ভালেরি, রুশী রেওয়াজ মত তোমাকে বলছি: কাজ শুভ হোক! — বলে আমাদের পরিচালনা কেন্দ্র। — আর তোমাদের আমেরিকান বন্ধুদের বলছি: গুড লাক্!

শেষ কথাগুলি উচ্চারিত হয় ইংরেজীতেই।

'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলোর' মধ্যেকার দূরত্ব কমে আসছে। টমের সঙ্গে রয়েছে আমার দু-তরফা বেতার যোগাযোগ। সে বলে রুশীতে, আমি ইংরেজীতে।

— আলেক্সেই, তোমাকে ভালই শুনতে পাচ্ছি, — বলে টম।

— বাঃ, কী চমৎকার দৃশ্য। — বলি তাকে।

অনুদৈর্ঘ্য অক্ষদণ্ডের ওপর 'সয়ুজের' ওলট-পালট **শুরু হয় সন্ধ্যা ৭টা বেজে ৪ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ডের সময় — ভালেরি কাঁটায়-কাঁটায় সময়ের হিসেব রেখেছে।**

'অ্যাপলোর' ডকিং অ্যাসেমব্লির (সংযোজন গ্রন্থির) তিনটি খোলা পাপড়ি চলে যায় 'সয়ুজের' ডকিং অ্যাসেমব্লির পাপড়িগুলির মধ্যে।

তারপর — সামান্য একটু ঝাঁকানি, আর সঙ্গে-সঙ্গেই সংকেত: 'সব ঠিক'।

— ব্যস, সংযোজন সম্পন্ন।

'সয়ুজ' আর 'অ্যাপলো' মিলে গঠিত হল নতুন ও **মজবুত একটি ২০-টনী মহাজাগতিক গৃহ।**

সময় — সন্ধ্যা ৭টা ৯ মিনিট। সংযোজন সম্পন্ন হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের তিন মিনিট আগে। টমের 'বেপরোয়াইয়ের' জন্যে? অভিযানের অন্যতম পরিচালক ড. গ্লাগভ হাসেন:

— স্ট্যাফোর্ডকে আমরা আমাদের 'ধর্মাবলম্বী' করতে পেরেছি। সংযোজনটি হয়েছে চমৎকার।

মহাকাশে করমর্দন

সংযোজন — শুধু 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযান কর্মসূচিরই সর্বোত্তম মুহূর্ত নয় সেটি, সেটি সারা মানবজাতিরও একটি সর্বোত্তম মুহূর্ত। এই মুহূর্তে পৌঁছতে মানবজাতিকে সইতে হয়েছে প্রচুর দুঃখকষ্ট, তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে বহু দুর্গম পথ। অতীতের ক্ষত ফিরে ফিরে দিয়েছে জানানি, পদে পদে হতে হয়েছে সাবধান, আর সময় সময় — পরস্পরকে এমনকি জানতেই চাই নি আমরা।

মানবজাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা স্বপ্ন দেখেছেন সেদিনের, যখন দুনিয়ার সকল জাতি মিলেমিশে বাস করবে একটি পরিবারে, থাকবে ভাইয়ের মত। আমাদের পৃথিবীতে এখনও রয়েছে কত অন্যায় আর অবিচার। তবে সুন্দর আর মঙ্গলেরই শক্তি বেশি। আরও বৃদ্ধি হোক সে শক্তি! তার জন্যে সারা দুনিয়ার মানুষকেই শান্তিতে থাকা চাই।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসঙ্ঘের রয়েছে বিপুল অবদান। তাই 'সয়ুজে' আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাই এই সংস্থাটির পতাকা। শান্তির প্রতীক হিসেবে মহাকাশে আমরা তা তুলে দিই আমাদের আমেরিকান বন্ধুদের হাতে। পরে ভালেরি আর আমি যখন আমেরিকায় যাই, আমেরিকান বন্ধুদের সঙ্গে মিলে পতাকাটি আমরা জমা দিই জাতিসঙ্ঘে চিরকাল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে।

মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাকিছু অর্জন করেছে তাতে অন্যান্য দেশেরও রয়েছে অধিকার। এই সমস্ত সাফল্যে অধিকার রয়েছে সারা দুনিয়ার, আমাদের অপূর্ব পৃথিবীর বাসিন্দা ছোট-বড় সব জাতির।

আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাই আমাদের দুই দেশের জাতীয় পতাকা, মহাজাগতিক কক্ষপথে প্রথম আন্তর্জাতিক সহযোগিতা উপলক্ষে স্মৃতিচিহ্ন ও অন্যান্য উপহার। টম স্ট্যাফোর্ড আমাদের একটি চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছিল গাছের বীজের ব্যাপারে। তার কথা মেনেই আমরা আর আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা মহাকাশে সঙ্গে নিয়ে যাই নিজ নিজ দেশের বিভিন্ন জাতের গাছের দুই কৌটো বীজ। মহাকাশে আমরা কৌটোগুলি বিনিময় করি এবং পৃথিবীতে ফেরার পর মৈত্রীর সে বীজ বপন করে দিই নিজ নিজ দেশে।

তবে এ সবকিছু পরের কথা। আপাততঃ নিজেদের হ্যাচ-ওয়েটি খুলে আমরা অপেক্ষা করছি কখন খুলবে 'অ্যাপলোর' হ্যাচ-ওয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হ্যাচ-ওয়েটি কেঁপে উঠল, তারপর গেল খুলে। দেখতে পেলাম হাসিখুশি টমকে, শুনতে পেলাম তার আনন্দে-ভরা জোরালো কণ্ঠস্বর:

— কী খবর, আলেক্সেই? এখানে এসো, আমার কাছে। — টম চেষ্টা করছে যাতে রুশী শব্দগুলো স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে। তার মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যও দেখা যাচ্ছে। সে হয়তো ভাবল যে আমি তার কথাগুলি ঠিক বুঝতে পারি নি, তাই আবার ইংরেজীতে বলল: — প্লিজ কাম ইন, আলেক্সেই!

আমিও হয়তো আনন্দে একটু আত্মহারা হয়ে পড়ি। তাই টমের মুখে রুশ ভাষায় উচ্চারিত অভিবাদনের মতই সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর শোনালো ইংরেজীতে উচ্চারিত আমার অভিবাদনটিও। মোটেই আনুষ্ঠানিক নয় তা:

— এসো টম, এসে পড়ো!

ভেসে ভেসে আমরা এগিয়ে গেলাম পরস্পরের দিকে, করলাম করমর্দন, হল আলিঙ্গন। তখন আমরা কী অপরিসীম আনন্দে অভিভূত! সে আনন্দ আর সংবরণ করতে পারি নি।

ঐতিহাসিক গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সম্পাদক লেওনিদ ব্রেজনেভের অভিনন্দনবাণী এবং 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলোর' চালকদলের উদ্দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডের বার্তা আমরা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করি।

'বৈজ্ঞানিক গবেষণার জটিল কর্মসূচি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আপনাদের সম্মিলিত কাজ গভীর মনোযোগ ও পরম আনন্দ সহকারে নিরীক্ষণ করছে সারা পৃথিবী, — বলা হয় কমরেড লেওনিদ ব্রেজনেভের অভিনন্দনবাণীতে। — সাফল্যপূর্ণ সংযোজন প্রমাণ করেছে সোভিয়েত ও মার্কিন বিজ্ঞানী, পরিকল্পক আর মহাকাশচরদের মিলিত প্রয়াসে প্রস্তুত ও বাস্তবায়িত প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্তসমূহের যথার্থতা। বলা যায় যে 'সয়ুজ'-'অ্যাপলো' হচ্ছে ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক কক্ষ স্টেশনগুলিরই প্রতিরূপ।'

আর মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ড তাঁর বার্তায় বলেছেন, 'পারিপার্শ্বিক বিশ্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি প্রসারের উদ্দেশ্যে মানবজাতির প্রয়াসে আপনাদের মহাকাশ অভিযান হল একটি নতুন পর্যায়। তাতে আরও একটি বিষয় নিশ্চিত হয়েছে এবং তা এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করতে পারে।'

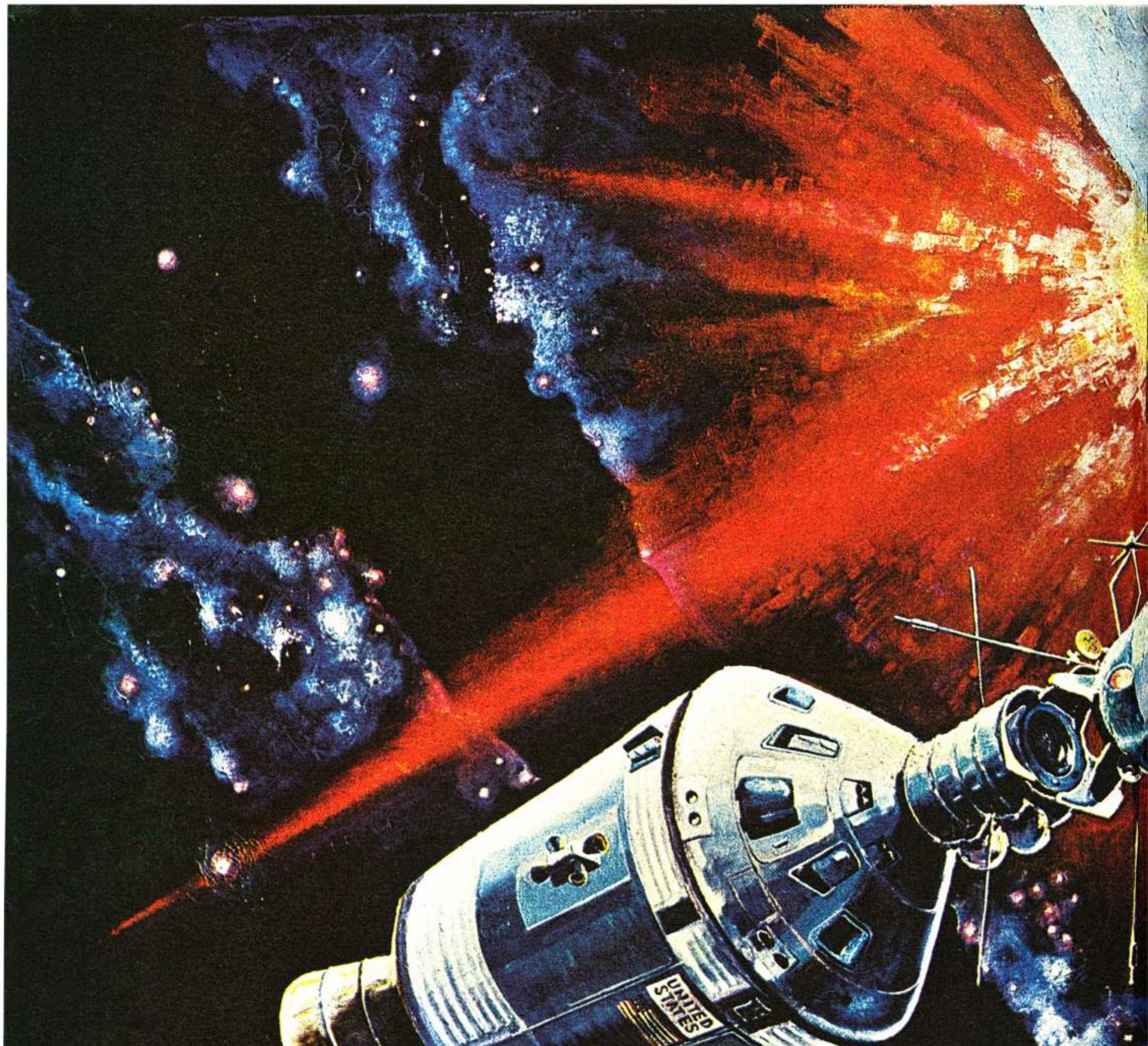
UNITED STATES

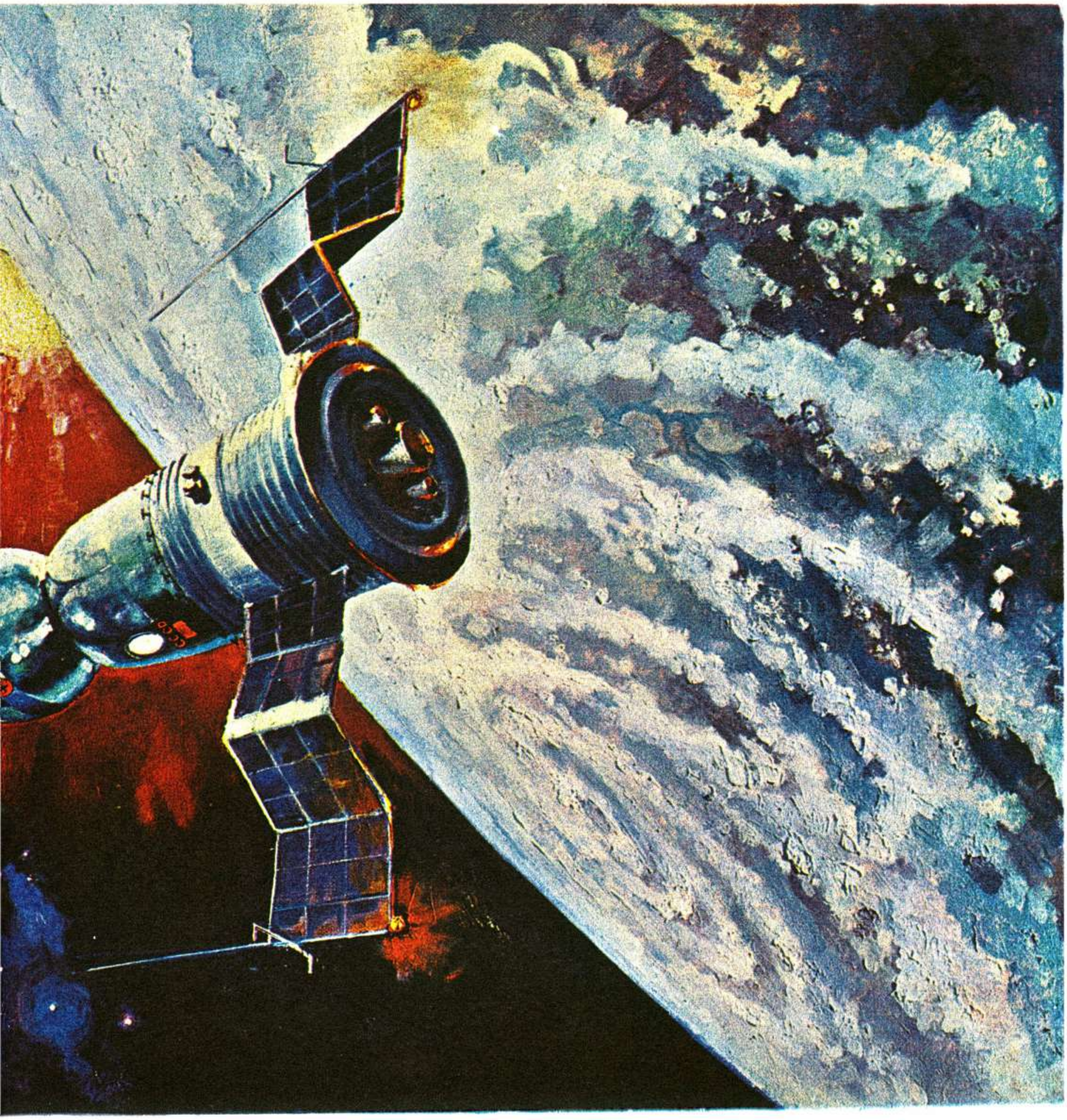

‘সয়ুজ’-‘অ্যাপলো’ মহাকাশযানদ্বয়ের মিলন

তারপর আমরা বেড়াতে গেলাম পরস্পরের কাছে — ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে সেটাই তো রীতি। প্রথমে আমাদের কাছে এল টমাস স্ট্যাফোর্ড আর ডনাল্ড স্লেইটন। নিজ নিজ দেশের পতাকা বিনিময় করি আমরা, একসঙ্গে বসে খাই। 'মদও' টানলাম — তবে তা আসল মদ নয় কিন্তু, বেরির রস। ততক্ষণে ভালেরি রওনা দিল ভ্যান্স ব্রান্ডের কাছে।

মহাকাশে প্রতিটি মুহূর্তই খুব মূল্যবান। তাই খাওয়া-দাওয়া সেরে সঙ্গে-সঙ্গেই আমরা যৌথ কাজে হাত দিই। আমাদের ডাকসাইটে মহাজাগতিক ঝালাই-মিস্ত্রি ভালেরি ডনাল্ডের সঙ্গে মিলে শুরু করল যৌথ বৈজ্ঞানিক গবেষণা — 'বহুমুখী চুল্লী'। টম আর আমি স্বাক্ষর করি মহাকাশে প্রথম আন্তর্জাতিক সংযোজন সম্পর্কিত দলিল এবং বিনিময় করি প্রতিটি চালকদল কর্তৃক নিয়ে আসা স্মৃতিচিহ্ন। পরদিন, ১৯৭৫ সালের ১৮ই জুলাই, আমি গেলাম 'অ্যাপলোয়'। সেদিন টম আর আমি পরস্পরের কাছ থেকে গ্রহণ করলাম সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রতীক খোদিত দু'টি স্মৃতিফলক। ফলকগুলির প্রতিটিতে ছিল মহাকাশযান দু'টির সংযোজনের তারিখ।

বার বার চালকদলগুলির জায়গা বদল হওয়া সত্ত্বেও আমরা সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে চেষ্টা করেছি। পাঁচজনে মিলে আমরা যেন ছিলাম একটি চালকদল। প্রকৃত পক্ষে ছিলও তাই, নতুবা সবকিছু করা সম্ভব হত না। আগেই আমি তোমাকে বলেছি যে আমাদের মহাজাগতিক গৃহ 'সয়ুজ'-'অ্যাপলোয়' যদি কোন মারাত্মক সংকট দেখা দেয় তাহলে প্রত্যেককে যার-যার জায়গায় থাকতে হবে এবং সেই অবস্থাতেই আলাদা-আলাদাভাবে ফিরতে হবে পৃথিবীতে। আর সেই জন্যেই প্রত্যেকটি মহাকাশযান ও তার খুঁটিনাটি সমস্তকিছু আমাদের ভাল করে জানা একান্তই দরকার ছিল।

আমাদের সম্মিলিত মহাকাশ অভিযান অতি চমৎকারভাবেই সম্পন্ন হল এবং আমাদের আন্তর্জাতিক মহাজাগতিক গৃহে কোনরূপ সংকটও দেখা দেয় নি।

মহাকাশ থেকে আমাদের সাংবাদিক সম্মেলনেও অংশ গ্রহণ করতে হয়। হরেক রকমের প্রশ্ন ছিল। যেমন এ ধরনের প্রশ্নও বাদ পড়ে নি: মার্কিন মহাকাশচরদের আপনারা কী খেতে দিয়েছেন আর তাঁরাই বা আপনাদের কী খাইয়েছেন?

মহাজাগতিক খাদ্য — জিনিস সম্পূর্ণ আলাদা, পৃথিবীতে আমরা যা খাই তা নয় মোটেই। এই খাদ্য তৈরি হয় বিশেষ এক পদ্ধতিতে, মহাজাগতিক খাদ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা। কোন এক প্রাচীন দার্শনিক বলেছিলেন, 'খাবার ভাল না মন্দ তা নির্ভর করে কার সঙ্গে খাচ্ছ'। আমরা খেয়েছি আমাদের চমৎকার বন্ধুদের সঙ্গে, এবং সেটাই আসল কথা। আর খাবারের কথা বলতে গেলে বলব, তা ঠিক 'মহাজাগতিক মানেরই' খাদ্য।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে স্ট্যাফোর্ড আর আমি দৃষ্টিপাত করলাম আমাদের অদূর ভবিষ্যতে।

স্ট্যাফোর্ডকে প্রশ্ন করা হয়: 'আর কী ধরনের মহাকাশ অভিযানে আপনি আবারও অংশ নিতে চান?'

স্ট্যাফোর্ড বলে:

— হামেশাই ইচ্ছে হয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাকাশযানে উড়তে, নতুন অভিযানে অংশ নিতে। আমাদের 'স্পেইস শাটল' কর্মসূচি শুরু হতে আর বেশ বাকি নেই, এবং আমি অবশ্যই তাতে যোগ দিতে চাই। আশা করি, নতুন সম্মিলিত অভিযানের জন্যে আলেক্সেইও ততদিনে নতুন একটি মহাকাশযান পেয়ে যাবে। মানবজাতি প্রগতির পথ ধরে চলেছে। গড়ে উঠবে নতুন মহাজাগতিক প্রকৌশল। আমার আশা আছে, ভবিষ্যতে যৌথ অভিযানের জন্যে ব্যবহৃত হবে নতুন ও অধিকতর উৎকৃষ্ট সব মহাজাগতিক সাজসরঞ্জাম। তাতে উপকৃত হবে গোটা দুনিয়ার মানুষ।

টমের সঙ্গে আমি একমত। আমিও অবশ্য এমন কোন মহাকাশযানে উড়তে চাই যা দীর্ঘকাল ধরে প্রদক্ষিণ করবে ভূ-গোলকের চারিদিকে। তাহলে আমি শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখতে পাব আমাদের পৃথিবীর অপরূপ চেহারা, তার বিভিন্ন রঙ। এই সমস্তকিছু স্মৃতিবদ্ধ ক'রে এনে পৌঁছে দেব পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে। এখনকার চেয়ে আরও বেশি ওপরে উড়তে চাই আমি। ওখান থেকে পৃথিবীকে দেখাবে সম্পূর্ণ অন্য রকম।

বিদায় ও প্রত্যাবর্তন

১৯শে জুলাই ভালেরি আর আমি 'সয়ুজে' নিজ নিজ জায়গা নিলাম, আর আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা — 'অ্যাপলোয়'। আমাদের মহাকাশযানে আমরা বায়ুচাপ বাড়ালাম এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে নিয়ে এলাম স্বাভাবিক পর্যায়ে।

পৃথিবীতে থাকতে আমরা মার্কিন বিজ্ঞানীদের অনুরোধ করেছিলাম তাঁরা যেন আমাদের আরও একটি যৌথ বৈজ্ঞানিক গবেষণা — কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ ঘটানোয় সম্মতি দেন। সম্মতি পেয়েছিলাম।

আমাদের পৃথিবী থেকে যে সূর্যগ্রহণ দেখা যায় তা থেকে সর্বদা পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না। সূর্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পেতে বাধা দেয় পৃথিবীতে অহরহ ঘটমান বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তন। মহাকাশে ব্যাপার আলাদা। ওখানে সূর্যগ্রহণ নিরীক্ষণ করতে কিছুই বাধা দেয় না। তাই আমরা যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ক'রে আনি তা বহু বিজ্ঞানীকেই আকৃষ্ট করে।

সেদিনই আনাতলি ফিলিপচেঙ্কো ও নিকোলাই রুকাভিশনিকভের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ জুটে যায় আমাদের।

— 'সয়ুজ', শুনতে পাচ্ছ? আমি ফিলিপচেঙ্কো। কী খবর তোমাদের?

বন্ধুর গলা শুনে আমি খুশি।

— আপাততঃ সবকিছুই ঠিকঠাক।

— আমার মনে হয়, এর পরেও সবকিছু ঠিক চলবে। তোমাদের পরিবারের তরফ থেকে তোমাদের জন্যে অনেক শুভেচ্ছা। সবাই চিন্তিত। তোমাদের পথ চেয়ে বসে আছে।

ভালেরি — নিজের মিতকাকে ছেড়ে যে একদিনও বাঁচতে পারে না — রাগের ভান করে বলে:

— চিন্তা করার আবার কী আছে? আমাদের সবকিছুই ঠিক চলছে।

— আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা কেমন?

— এখনও ঘুমচ্ছে. — বলে ভালেরি। — কাল সারাদিন ভীষণ খাটুনি গেছে।

— ওদেরও জানাবে আমাদের শুভেচ্ছা, — বলে আনাতলি, আর নিকোলাই যোগ করে:

— পৃথিবীতে দেখা হবে, খুব অপেক্ষা করছি কিন্তু!

১৯শে জুলাই বিকেল তিনটের সময় শুরু হল 'সয়ুজ' ও 'অ্যাপলোর' বিয়োজন। আমেরিকান বন্ধুরা দিক নির্ণয় করে ফেলে ও জানতে চায় আমরা বিয়োজনে প্রস্তুত কিনা। বললাম, আমরা প্রস্তুত। 'বাঁধ' খুলে ফেলার আগে 'অ্যাপলোর' চালকদল শেষবারের মত আবার জানাল মহাকাশযান বিয়োজনের জন্যে প্রস্তুত।

আমাদের মহাকাশযান দু'টি ধীরে ধীরে সরে পড়ল।

মার্কিন মহাকাশচররা সরে গিয়ে আমাদের মহাকাশযানের ছবি তুলল — এই ছবিগুলির সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা পরে গবেষণা করেন আমাদের মহাকাশযানের অন্ধকারাচ্ছন্নতার মাত্রা। রিঅ্যাক্টিভ পরিচালন-যন্ত্রের এঞ্জিন চালু করে দিয়ে 'অ্যাপলো' শুরু করল 'কৃত্রিম সূর্যগ্রহণ' নামক গবেষণা।

সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য! ভালেরি আর আমার ভয় ছিল, 'অ্যাপলোর' এঞ্জিন থেকে বেরিয়ে আসা শিখা সূর্যগ্রহণের দৃশ্যটি একেবারে মাটি করে দিতে পারে। আমি তখনও জানতাম না সূর্যগ্রহণের সময় তোলা আমাদের ছবিগুলো কেমন হবে। আমার সামনে উদ্ভাসিত রঙগুলি ছিল এতই অপরূপ আর অকল্পনীয় যে তা আর বলার নয়। সে রঙ আমার কল্পনাকে করেছে পরাহত। তাই বাড়িতে ফিরেই আমি সমস্তকিছু আঁকতে বসলাম।

আমাদের মহাকাশযানগুলির মধ্যে দূরত্ব যখন প্রায় ২২০ মিটার, 'অ্যাপলো' গতিরোধের এঞ্জিনটি চালাল। মহাকাশযান দু'টি আবার তৈরি হল মিলনের জন্যে — সক্রিয় মহাকাশযানের ভূমিকা এবার 'সয়ুজের', আর 'অ্যাপলো' ছিল অক্রিয়।

বিকেল ৩টা ৪০ মিনিটের সময় সংযোজন সম্পন্ন হয়। তবে দ্বিতীয় সংযোজনের পরে মহাকাশচরদের নতুন কোন সাক্ষাতের কথা ছিল না। সন্ধ্যে ৬টা ২৬ মিনিটের সময় শেষবারের মত পরস্পরকে আমরা বিদায় জানাই।

বিদায় 'অ্যাপলো', বিদায় আমাদের আমেরিকান বন্ধুরা — টম স্ট্যাফোর্ড, ডিক স্লেইটন, ভানিয়া ব্রান্ড! পৃথিবীতে, আমাদের সবার মাতৃভূমি ও সবার বাড়ি সেই অপূর্ব নীল পৃথিবীতে আবার দেখা হবে।

মস্কো সময় রাত ১১টার দিকে 'অ্যাপলো' কক্ষপথ ছেড়ে দিল। ফলে 'সয়ুজের' সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার ভয় আর থাকল না। আর তারপর শিগগিরই সে চলে গেল আমাদের দৃষ্টির অগোচরে।

'অ্যাপলোর' সঙ্গে বিচ্ছেদের পর পুরো একটি দিন আমরা ব্যস্ত থাকি কয়েকটি জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় — বিজ্ঞানীরা আমাদের কাছ থেকে অপেক্ষা করছেন যত বেশি সম্ভব তথ্য। তুলি সূর্যোদয়ের ছবি — তা কাজে লাগবে আবহ- আর আলোক-বিজ্ঞানীদের।

অভিযান শেষ হয়ে আসছে। ভালেরি আর আমি জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি নিয়ে যাই অবতরণ-যন্ত্রে। কাজের ফলাফল এবার হাতে। আবার পরখ করে নিই সবকিছু। শেষ টেলি-রিপোর্ট — তারপর যোগাযোগ বজায় থাকবে একমাত্র বেতার মাধ্যমে:

সমস্ত পরিকল্পিত গবেষণা সম্পাদিত। পৃথিবীতে ফেরার জন্যে তৈরি হচ্ছি। কাল আমরা চালু করব ব্রেক এঞ্জিন, আর তার ৪৫ মিনিট পরে দেশে পৌঁছে যাব। পৃথিবীর মাটিতে দেখা হবে!

আমরা ফিরছি আপন পৃথিবীতে। কী আনন্দ! ২১শে জুলাই সকালে ৯৫তম প্রদক্ষিণের সময় ভালেরি আর আমি পরে নিলাম আমাদের মহাজাগতিক পোশাক এবং চলে এলাম 'সয়ুজের' অবতরণ-যন্ত্রে। দিক ঠিক, সবকিছু স্বাভাবিক।

এঞ্জিন তার পুরো কাজ করে ফেলেছে। কক্ষপথ ছেড়ে দিয়ে মহাকাশযান ছুটল পৃথিবীর দিকে। পৃথিবীর ওপরে আমাদের উচ্চতা এখন ২১৭ কিলোমিটার, 'অ্যাপলো' থেকে দূরত্ব প্রায় ৮০০ কিলোমিটার।

আমরা যখন মধ্য আফ্রিকার আকাশে, 'সয়ুজের' অবতরণ-যন্ত্র থেকে ছিটকে গেল আমাদের কক্ষপথের 'কামরাটি'। কক্ষ 'কামরাটির' জন্যে আমাদের একটু দুঃখ হল — ওতে চলে 'মহাজাগতিক অভ্যর্থনা সভা'। কিন্তু কী আর করা যায়! মহাকাশযান থেকে টিকে থাকে শুধু তা-ই যা একমাত্র পরবর্তী কাজেরই জন্যে অপরিহার্য।

— 'সয়ুজে' সবকিছু ঠিক আছে। ঠিক সময়েই বিচ্ছেদ ঘটেছে, চমৎকার চলছি, — বলি আমি পৃথিবীকে। পৃথিবী বলে:

— তোমাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি।

ভালেরি দেয় ধমক:

— আর কেন তোমরা কান পেতে আমাদের কথাবার্তা শুনছ?

অবতরণ-যন্ত্রের মেশিন কেমন কাজ করছে তা শোনা যাচ্ছে।

শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক। সবই ভাল চলছে। পেছনে কাস্পিয়ান সাগর। আবহমণ্ডল প্রতিরোধ দিচ্ছে।

— সবই ভাল, — জানাই আমি পৃথিবীকে।

— কেমন বোধ করছ?

— চমৎকার। ধন্যবাদ!

— অবতরণ ক্ষেত্রে পৌঁছতে ২৫ কিলোমিটার...

এক্ষুণি খুলে যাবে ব্রেক প্যারাশুট, তারপর — আসল প্যারাশুটটি। সমস্তকিছু স্বাভাবিক।

হঠাৎ খুলল বিরাট প্যারাশুটটি। আর কয়েক মিনিট পরেই... পৃথিবী।

অপরাহ্ণ ১টা ৫০ মিনিটে আমরা পৃথিবীতে অবতরণ করি। সন্ধানকারীরা হ্যাচ-ওয়েটি খুলে দেয়, পেটির বাঁধ মুক্ত হতে করে সাহায্য। ব্যস, এবার আমাদের ঘিরে ফেলে বৈমানিক, ডাক্তার আর সাংবাদিকরা। ছুটে প্রশ্নের বাণ, ইচ্ছে হয় একসঙ্গে সব প্রশ্নের উত্তর দিই, চাই সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে। তাই আমি বলি:

— প্রিয় বন্ধুগণ, অভিযান সমাপ্ত। কাজটি কঠিনই ছিল। খুবই কঠিন। তবে আমরা আনন্দিত যে তা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে আর আমরা এখন দেশের মাটিতে। আমরা একটু টলছি। টলছি আনন্দে, পরিশ্রমে আর অনিদ্রায়। গত ক'দিনে সব মিলিয়ে আমরা ঘুমিয়েছি হয়তো ২০ ঘণ্টা। আপনাদের সাহায্য ও যত্নের জন্যে ধন্যবাদ।

— মার্কিন মহাকাশযানের সঙ্গে আমাদের মিলন হয়েছে, দেখা হয়েছে মার্কিন মহাকাশচরদের সঙ্গে, তাদের সঙ্গে করেছি করমর্দন, — বলে ভালেরি। — এখন আমরা খুশি যে আবার আমরা পৃথিবীর মাটিতে।

বন্ধুদের কেউ আমাদের একটুকরো খড়িমাটি বাড়িয়ে দিল। আমাদের আদরের 'সয়ুজ-১৯' মহাকাশযানের কালি-পড়া গায়ে মোটা মোটা অক্ষরে ভালেরি আর আমি লিখে রাখি:

'ধন্যবাদ!'

...১৯৭৫ সালের ২৫শে জুলাই তিনজন মার্কিন মহাকাশচর — টমাস স্ট্যাফোর্ড, ভ্যান্স ব্রান্ড ও ডনাল্ড স্লেইটনকে নিয়ে 'অ্যাপলো' মঙ্গলমত অবতরণ করল প্রশান্ত মহাসাগরে। 'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' গবেষণামূলক যৌথ মহাকাশ অভিযান কর্মসূচি হল সম্পাদিত।

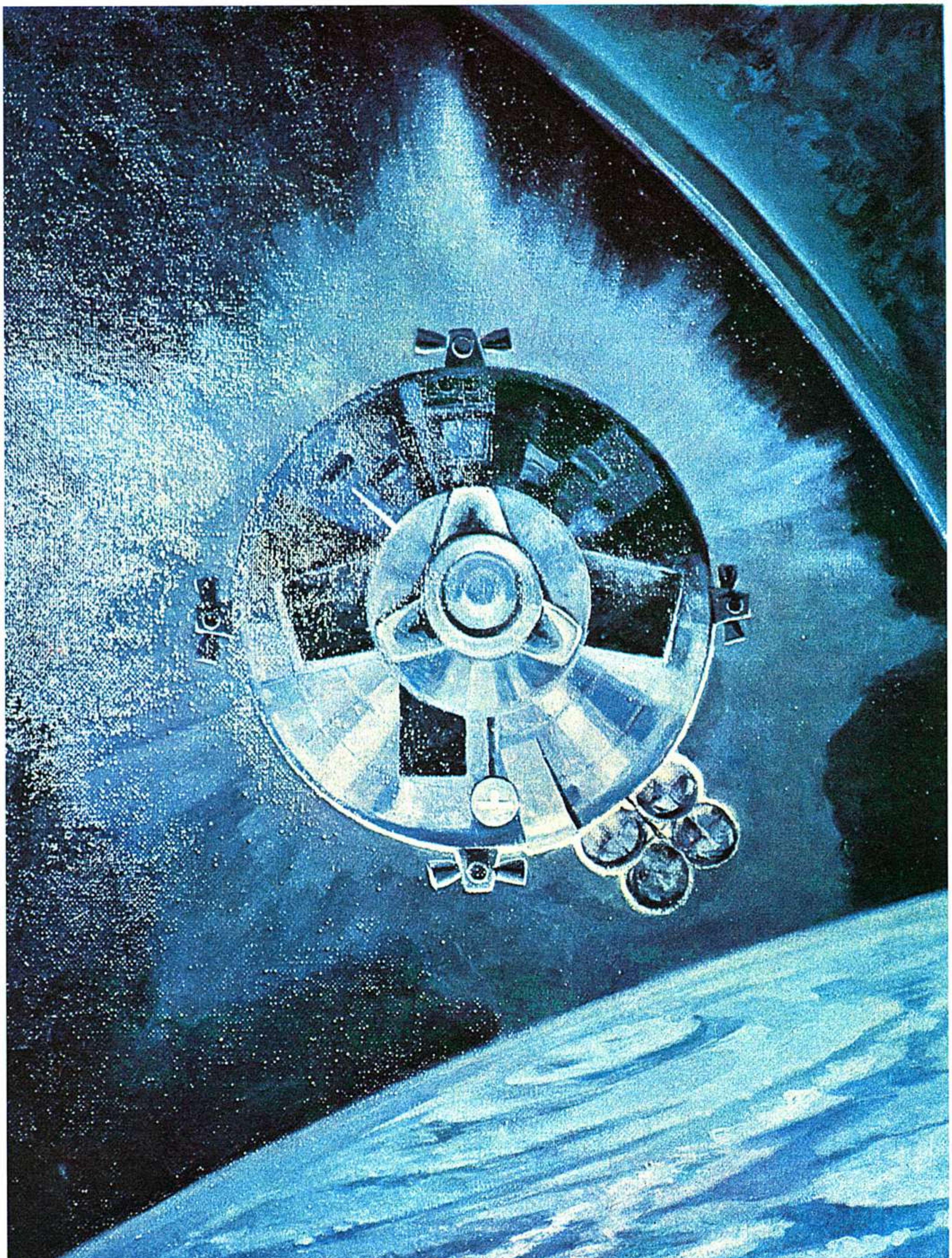

সৌর কিরীট

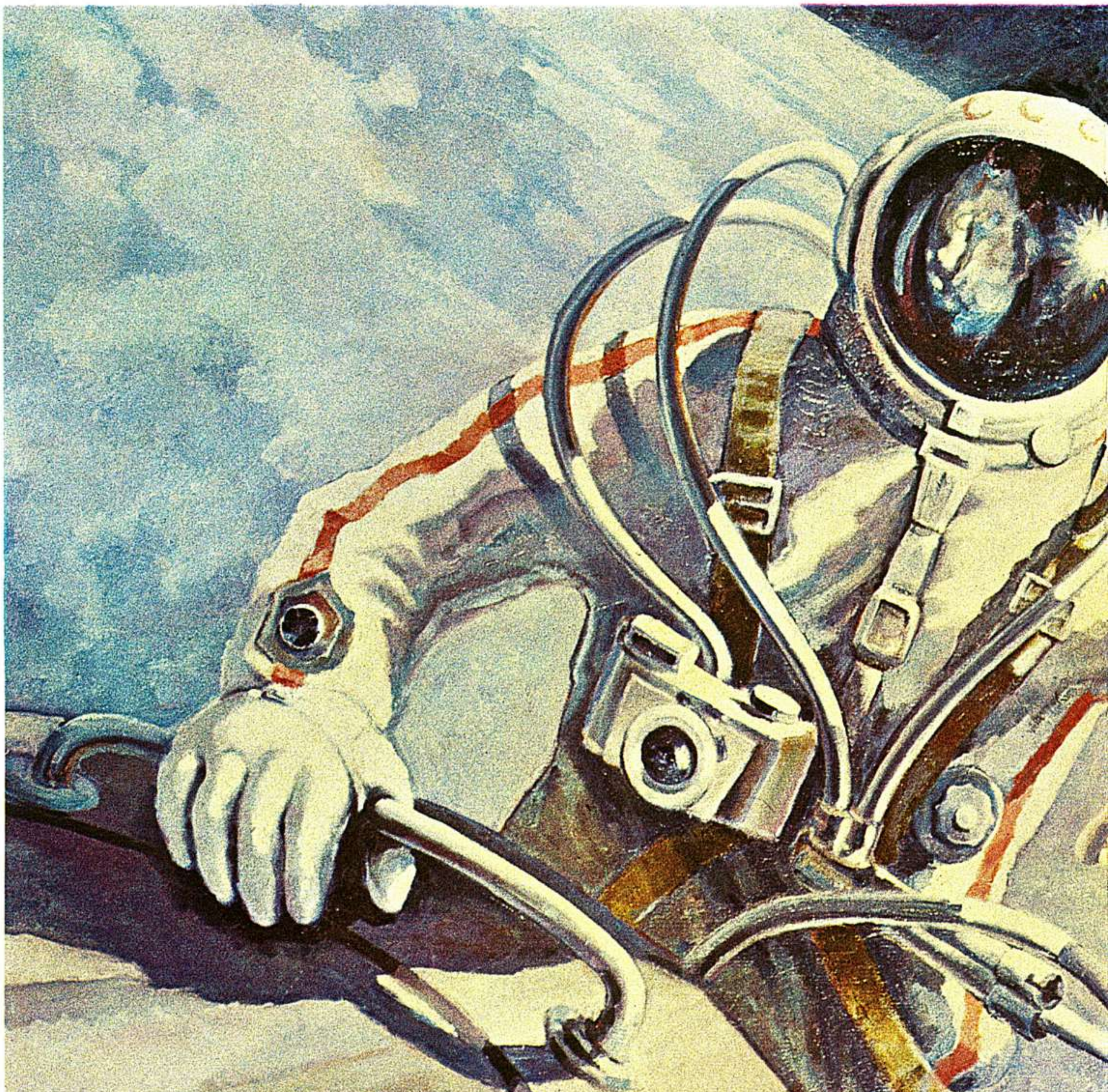

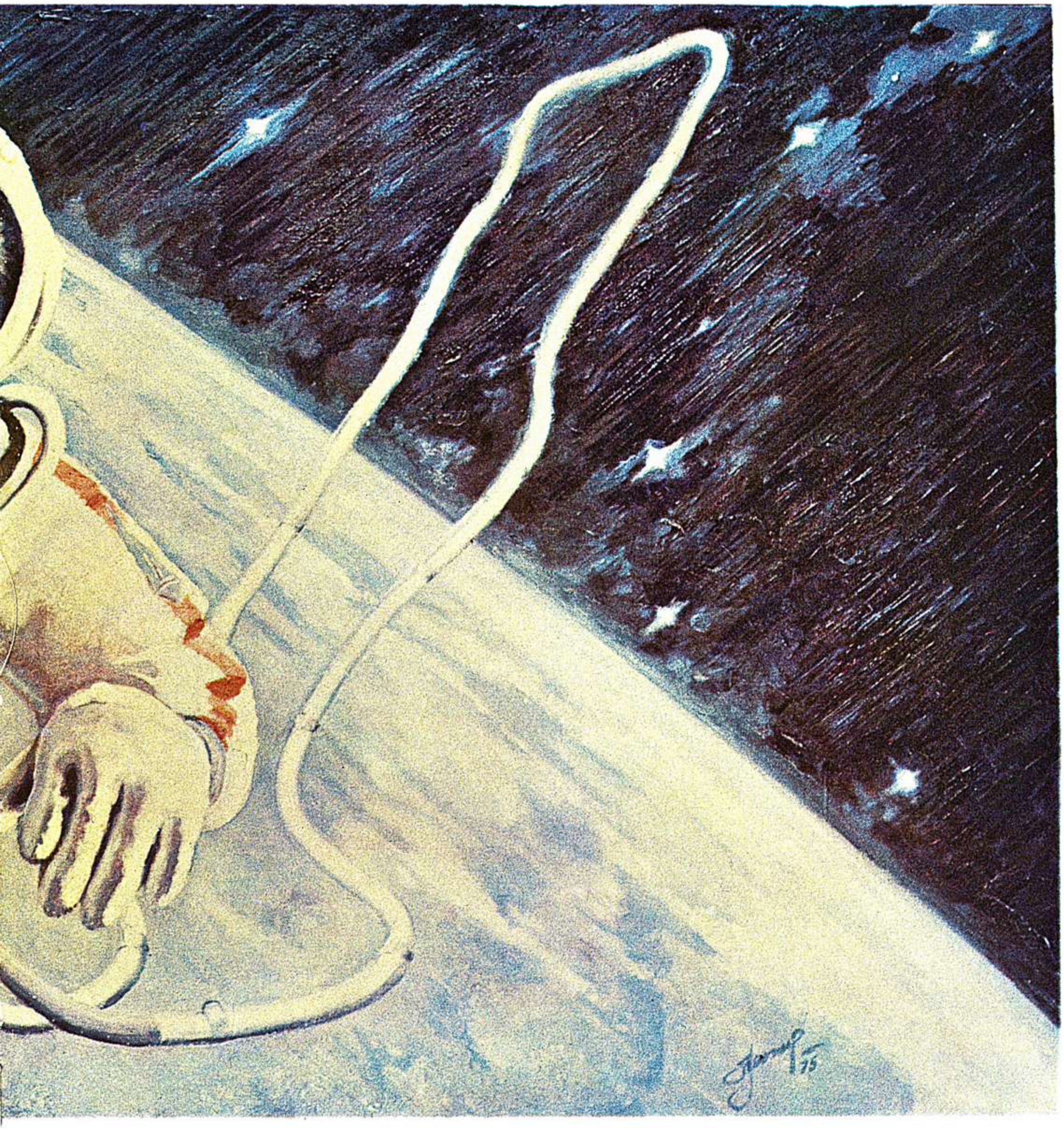

মহাকাশে পদক্ষেপ

উপসংহার

প্রিয় কিশোর বন্ধু! গল্প এবার শেষ। তোমাকে দেখালাম 'সয়ুজ'-'অ্যাপলো' মহাকাশ অভিযানের কয়েকটি ছবি। মহাকাশ বিজয়ে বিভিন্ন দেশের নতুন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সূচনা করল এই অভিযান। কাটবে আরও কিছুকাল, গ্রহ-নক্ষত্রে যাবে নতুন-নতুন মহাকাশযান, মানুষের মঙ্গলে তা পরিচালনা করবে নতুন-নতুন লোক। হয়তো এরূপ একটি মহাকাশযানে বসে তুমিও একদিন পাড়ি জমাবে মহাশূন্যে। সারা হৃদয় দিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তোমার জন্যে কামনা করছি অনেক অনেক সাফল্য।

প্রিয় বন্ধু, যাত্রা তোমার শুভ হোক!

সূচি
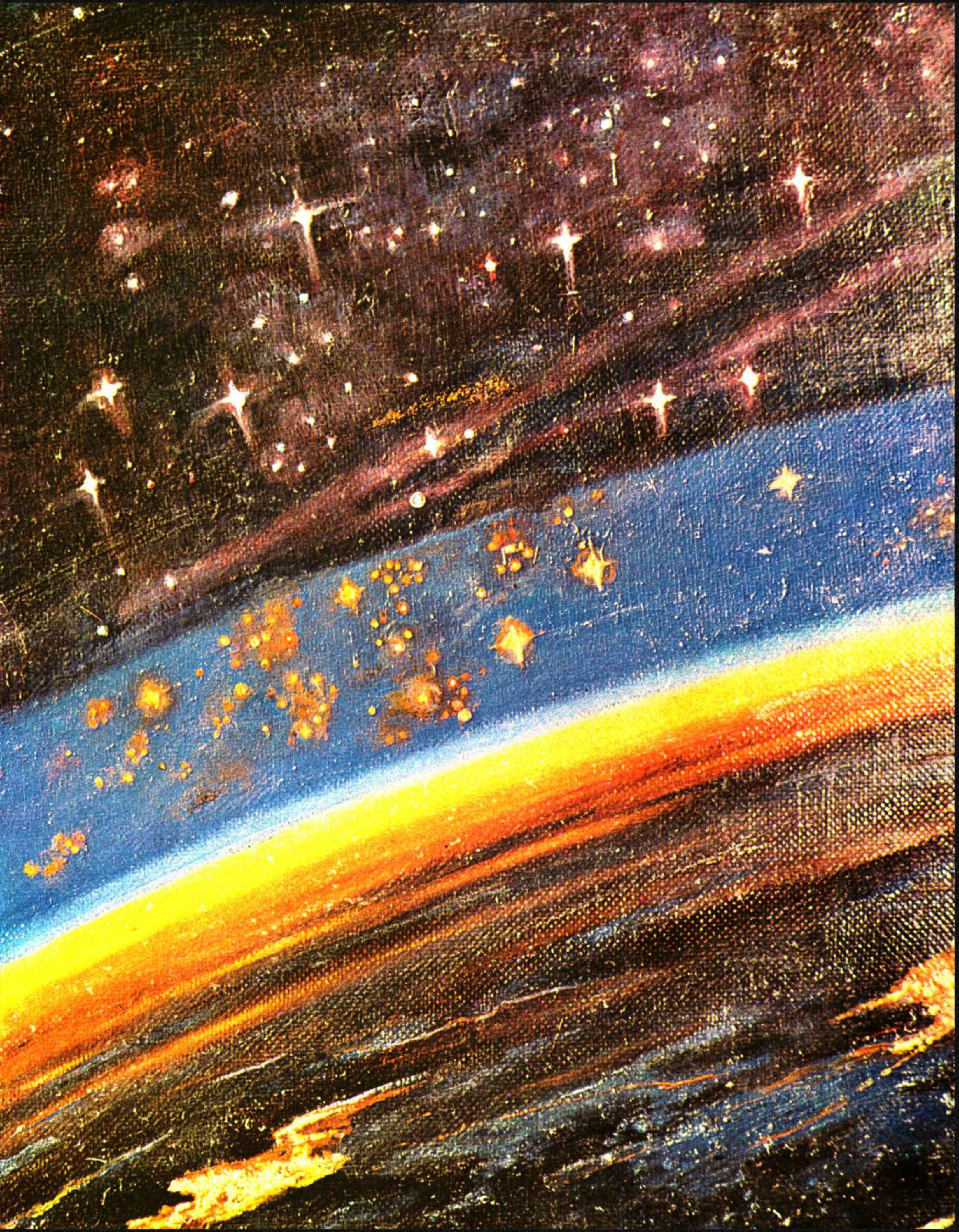
'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' অভিযান ৬
'অ্যাপলো'-'সয়ুজ' কিসের জন্যে? ৮
কীভাবে তৈরি হয় মহাকাশযান ১১
মহাকাশ অভিযানের প্রস্তুতি ১৬
টমাস স্ট্যাফোর্ড ২০
ডনাল্ড স্লেইটন ২১
ভ্যান্স ব্রান্ড ২২
মহাকাশচরের হাতে-খড়ি ২৩
কীভাবে আমি বড় হলাম ২৫
প্রথম আবিষ্কার ২৬
আমার বন্ধু ভালেরি কুবাসভ ২৭
আরও দুই মহাকাশচর ২৮
অভিযানের আগে ৩০
বাইকোনুরের পথে ৩২
যাত্রা ৩৪
কাজের শুরু ৩৬
মহাকাশে ৩৮
অভাবিত ঘটনা ৪০
মহাকাশচরদের রসিকতা বোধ ৪১
মিলনের আগে ৪২
মহাকাশে করমর্দন ৪৫
বিদায় ও প্রত্যাবর্তন ৪৯
উপসংহার ৫৪